AL-BALAGH 1437 | 2016 | ISSUE 1

পৌঁছে দেয়াই আমাদের দায়িত্ব

আল বালাগ

البلاغ

www.facebook.com/titumir2016

البلاغ
আল বালাগ

সূচী

নিরাশ হয়ো না বিজয় তোমাদেরই হবে

ইদানিং ঘরোয়া বা অন্য কোন আসরে রাজনৈতিক আলোচনার গন্ধ পেলেও যথাসম্ভব নির্লিপ্ত থাকার চেষ্টা করি। কারণ, লোপাটতন্ত্রের রাজনীতির প্রতি ন্যূনতম আকর্ষণও বোধ করি না। কটা সমস্যার কথা শেয়ার করবো; পুরো সিস্টেমটাই যে পঁচেগলে বিভৎস হয়ে আছে।

মানুষের মৌলিক অধিকার বলতে এ ব্যবস্থায় ফাঁকা আওয়াজ ছাড়া আর কী আছে? শ্রমজীবি খেটে খাওয়া মানুষ হোক কিংবা সমাজে প্রতিষ্ঠিত বিশিষ্টজন হোক– কার জীবনের নিরাপত্তা আছে? একদিকে তাজনীন গার্মেন্টস আর রানা প্লাজায় মানবতার চরম বিপর্জয় ঘটে, অন্যদিকে ক্ষমতার উৎসব পালনে শাসকদের ব্যস্ত সময় কাটে। একদিকে পেট্রোল বোমা আর আগুনসন্ত্রাস চলে অপরদিকে গুম-খুন, দমন-পীড়নের খড়গ নেমে আসে। কীসের জন্য? লোপাটতন্ত্র দখলে রাখার জন্যই তো! একদিকে কুলাঙ্গার নাস্তিকরা শত কোটি মুসলমানের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ করে জামাই আদরে বরিত হয়, অন্য দিকে নিরেট ঈমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে রাজপথে নেমে তাওহীদী জনতা শতাব্দীর ন্যাক্কার জনক লাঞ্ছনার শিকার হয়।

একদিকে শেয়ার বাজার থেকে হাজার কোটি টাকা লুট করে অপরাধীরা দম্ভভরে দাঁত কেলিয়ে হাসে, অন্য দিকে সর্বস্ব খুইয়ে টগবগে যুবক আত্মহত্যা করে। অসহায় গৃহকর্মীর বিশিষ্ট (!) নাগরিকদের দ্বারা নির্যাতন খুনের শিকার হয়, অন্য দিকে অপরাধীরা পুষ্পমাল্যে বরিত হয়। প্রকাশ্য দিবালোকে আমার মা-বোন লাঞ্ছিত হলেও লম্পটরা ধরা ছোঁয়ার রাইরে থেকে যায়। কয়টার কথা বলবো! প্রতি মুহূর্তেই ঘটে চলছে নতুন নতুন ট্রাজেডি। এতো গেল স্বদেশের কথা!

মুসলিম উম্মাহ কোথাও আজ শান্তিতে নেই। ফিলিস্তিনের মুসলমানদের দুঃসহ জীবনের খোঁজ নেয়ার গরজ কারো নেই। অথচ অবৈধ দখলদার ইসরাইল চতুর্দিক থেকে মুসলিম রাষ্ট্র দ্বারা বেষ্টিত। সম্ভবত আলী তানতাভী ফিলিস্তিন সম্পর্কে তার কোন এক লেখায় বলেছিলেন – 'মুসলমানরা যদি ইসরাইলকে অস্ত্র দিয়ে প্রতিরোধ করতে না পারে, তাহলে শুধু মরতে শিখুক; দেখবেন মুসলমানদের রক্তবন্যায় ইসরাইল পৃথিবীর মানচিত্র থেকে হারিয়ে যাবে।'

সিরিয়া, আফগানিস্তান, ইরাক, লিবিয়া, চীন, মায়ানমার, ভারত, পাকিস্তান কোথাও মুসলিমরা স্বাধীন হতে পারেনি। স্বাধীনতা বলতে কথিত স্বাধীনতা নয়; মুসলিমদের স্বাধীনতার অর্থ দীনের বিজয়। ইসলামের বিজয়। তবে, আশার কথা হল, পুরো পৃথিবীতেই একটা বিপরীত জোয়ার শুরু হয়ে গেছে। এ জোয়ার তাওহীদ পন্থী মুসলিমদের ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তনের। হারানো গৌরব ফিরে পাবার। শয়তানী রাজ চূর্ণ করে খোদায়ী রাজ কায়েমের।

মুসলিম তরুণ-যুবারা বুঝতে শুরু করেছে এ বিপ্লবে তাদেরই এগিয়ে আসতে হবে। ভয়কে জয় করে পূর্বসূরীদের দেখানো পথেই দুর্বার ছুটে যেতে হবে। কুফরী শাসন ব্যবস্থা মুসলমানরা পরখ করে ফেলেছে।

আর বোধহয় দাদারা সুবিধে করতে পারবে না। দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে, এবার পাল্টা আঘাত হানার সময়। আল্লাহর গায়েবী নুসরত তারা স্বচক্ষে দেখছে পৃথিবীর প্রান্তে- প্রান্তে। আফগানিস্তানের তালেবান মুজাহিদরা এক কুন্দুজ অভিযানে– ১০০টি ট্যাংকসহ বিপুল পরিমান সমরাস্ত্র ও সম্পদ গনীমত লাভ করেছে মাত্র কয়েক ঘন্টার লড়াইয়ে। ফিলিস্তিনে শুরু হয়ে গেছে তৃতীয় ইন্তিফাদা। সিরিয়া ও ইয়েমেনে চলছে ইমাম মাহদীর ভবিতব্য সৈন্যদলের ফ্রন্ট তৈরীর অদম্য প্রচেষ্টা।

হে যুবক! মাথায় কাফনের কাপড় বেঁধে সোনালী কাফেলায় যোগ দাও! সাকিব,তামীম তোমাদের আইডল নয়; তোমাদের আইডল শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বীর উসামা। হ্যাঁ, উসামা ও মোল্লা ওমর রহ.। বীর উসামার শপথ তো তোমারই পূর্ণ করবে। তিনি তো তোমাদের দিকে তাকিয়েই বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেছি-লন–

لن تحلم أمريكا ولا من يعيش في أمريكا بالأمن قبل أن نعيشه واقعا في فلسطين، وقبل أن تخرج جميع الجيوش الكافرة من أرض محمد صلى الله عليه وسلم

'আল্লাহর শপথ! আমেরিকা শান্তি-স্থিতির কল্পনাও করতে পারবে না, যতক্ষণ না আমরা ফিলিস্তিনে তাদের দম্ভ চূর্ণ করছি এবং পুণ্যভূমি জাজিরাতুল আরব থেকে ক্রুসেডারদের সর্বশেষ সৈনিকটিও বিতাড়িত হচ্ছে!'
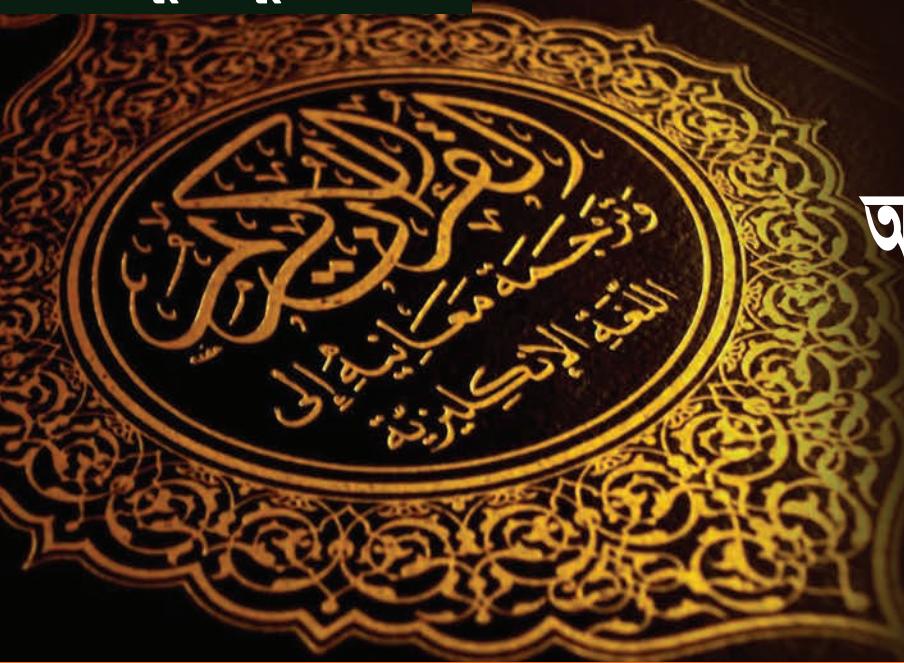
প্রকৃত মুমিন হতে হলে অন্তর নেফাকমুক্ত হতে হবে

মুফতী হাসান আব্দুল বারী

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ

'আর যদি তারা বের হওয়ার সংকল্প নিত তবে অবশ্যই কিছু সরঞ্জাম প্রস্তুত করতো; কিন্তু তাদের উত্থান আল্লাহর পছন্দ হয়নি, তাই তাদের নিবৃত রাখলেন এবং আদেশ হল– বসা লোকদের সাথে তোমরা বসে থাকো।' -সুরা তাওবা ৪৬ ব্যখ্যা: মোনাফেকরা প্রকৃত পক্ষে জিহাদে বের হতে চায় না। বের হওয়ার কোন মুরোদ তাদের নেই। সুতরাং তাদের এ দাবি অবান্তর যে, আমরা তো বের হতে চাই, কিন্তু অযাচিতভাবে নানা ঝামেলা এসে উপস্থিত হয়। তারা যদি বের হওয়ার সংকল্প নিত তবে অবশ্যই প্রস্তুতি নিত। জিহাদের সরঞ্জাম সংগ্রহ করতো। জিহাদের কামনা-বাসনা লালন করতো; কিন্তু এর কিছুই তারা করেনি। এ থেকে প্রতীয়মাণ হয়ে– এরা মূলত জিহাদে বের হতে চায় না; বরং বলা ভালো, এদের নেফাকের কারণে আল্লাহই চান না তারা বের হোক! আল্লাহ তাদেরকে জিহাদের মতো মহান সম্মানে ভূষিত করতে চান না বিধায়– তাদের অলস-অকর্মণ্য বানিয়ে দিয়েছেন ওজরগ্রস্ত, নারী-শিশুদের মতো ঘরে বসিয়ে রেখে। উপমহাদেশের প্রখ্যাত মুফাস্সির আহমদ আলী লাহোরী রহ. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, ' বোধগম্য কোন কারণে এরা জিহাদ থেকে দূরে থাকে না; বরং জিহাদের ইচ্ছায় কখনো প্রস্তুতি নেওয়ার কথা এদের মনেই উদয় হয় নি। তাই এমন বেইমানদের আল্লাহ জিহাদের মতো প্রবিত্র সফরে শরীক রাখতে চান না।

ইমাম আবু জাফর তাবারী রহ. فَثَبَّطَهُمْ এর ব্যাখ্যায় লিখেন,

فثقل عليهم الخروج حتى استخفوا القعود في منازلهم خلافك ، واستثقلوا السفر والخروج معك ، فتركوا .

'(তাদের নেফাকির কারণে) আল্লাহ জিহাদে বের হওয়াকে তাদের কাছে বড় কঠিন কাজ বানিয়ে দিয়েছেন। আর তাই তারা আপনার অবাধ্য হয়ে ঘরে বসে থাকাকে সহজ কাজ মনে করে আপনার সাথে বের হওয়ার চেয়ে। তাই তাদের পরিত্যাগ করা হয়েছে।' -তাফসীরে তাবারি

জিহাদের প্রস্তুতি নেওয়া ফরজ যদি সামান্য সময়ের জন্য ধরে নেওয়া হয় যে, যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছা তাদের ছিল; তবে ওজরগ্রস্ত হওয়ায় বের হতে পারেনি। তাহলে প্রশ্ন হবে- কেন প্রস্তুতি নেয় নি– এটাতো ফরজ ছিল। সমস্যাগ্রস্ত হলে ইমামই তাদের ছাড়পত্র দিবেন! আসল কথা হল আল্লাহ চান না এদের মতো দুমুখোদের জিহাদের মতো পবিত্র ইবাদতে শরীক রাখতে। কারণ, জিহাদে বেরুবার পূর্বেই যখন গাঁইগুই করছে, বাহান খুঁজছে, তাহলে তো জিহাদে গিয়ে আরা বড় ঝামেলার সৃষ্টি করবে। তাই মহান আল্লাহ তাদের দুরাচার থেকে মুজাহিদদের মুক্ত রাখার জন্য এদেরকে নিবৃত্ত করেছেন। যেমনটি আল্লাহ অন্য আয়াতে বিবৃত করেছেন এভাবে-

رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ

'বস্তুত অসহায় নারী-শিশু-অসুসথদের সাথে তাদের তুলনা করে; তিরস্কার করা হয়েছে।' -মাদারেক

শিক্ষা:

* জিহাদের জন্য না আছে সংকল্প, না আছে প্রস্তুতি, না তামান্না। অথচ লম্বা লম্বা ভাষণ দিতে পটু। এটা কি কোন মুসলিমের কাজ হতে পারে? ভেবে দেখা প্রয়োজন।

* কিছু মানুষ আছেন যারা নিজেদের জিহাদ ও মুজাহিদীনের চেয়ে সম্মানী মনে করেন। কোন অবস্থাতেই তারা জিহাদে বের হতে আগ্রহী নন। এ আয়াত তাদেরকে ডাক দিয়ে যায় আদর্শ পুনর্মূল্যায়নের।

*আয়াতের প্রেক্ষাপট ছিল তাবুক যুদ্ধ। রাসূল স. স্বয়ং মদীনার পবিত্র ভূমি ছেড়ে; দীনের তালীম, তরবিয়ত বন্ধ রেখে, এসলাহী তৎপরতা বন্ধ রেখে কোথায় রওয়ানা হলেন? জিহাদে নয় কি? অথচ আমরা জানি বাস্তবে এ যাত্রায় কোন যুদ্ধ হয়নি। তারপরও কোরআনে এ যুদ্ধের এত ফজিলত বর্ণিত হল কেন? যারা বের হননি তাদের সাথে এত কঠোরতা করা হল কেন? এ ঘটনা থেকে অবশ্যই আমাদের শেখার অনেক কিছু আছে, কথিত মাসলাহাতের গোলক ধাঁধায় আটকে আজ আমরা কোথায় যাচ্ছি অবশ্যই তা ভেবে দেখতে হবে। আল্লাহ আমাদের হৃদয়ের যাবতীয় সংশয় দূর করে দিন। নেফাকমুক্ত ঈমান দান করুন। আমরা যেন নবীওয়ালা সে দীন হৃদয়ে ধারণ করতে পারি। আমীন।

দারসুল হাদীস
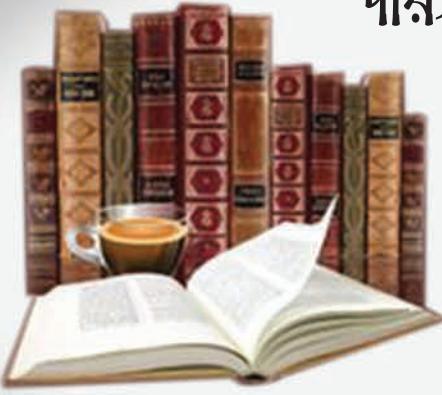
রক্তের মূল্য

শাইখ তামিম আল আদনানী হাফিজাহুল্লাহ

জিহাদ হচ্ছে গুরত্বপূর্ণ একটি ফরজ ইবাদত। জিহাদ হচ্ছে সর্বোত্তম আমল। জিহাদ হচ্ছে ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া। জিহাদ হচ্ছে উম্মাহর সম্মান ও মুক্তির পথ। সুতরাং আমাদের সতর্ক থাকতে হবে আমাদের কারণে যাতে জিহাদ নামক এই শ্রেষ্ঠ ইবাদত কুলষিত না হয়। আমাদের কারনে যাতে মুজাহিদীনদের আদর্শ কলঙ্কিত না হয়। আমাদের হাত দ্বারা যাতে অন্যায়ভাবে কোন মুসলিমের রক্ত প্রবাহিত না হয়। আমাদের আরো সতর্ক হতে হবে, অন্যায়ভাবে কাউকে তাকফির করে মুরতাদ ফতোয়া দেয়ার ক্ষেত্রে এবং অন্যায়ভাবে কোন মুসলিমের রক্ত প্রবাহিত করার ক্ষেত্রে। সাম্প্রতিক সময়ে শাম ও ইরাকের ভূমিতে আমরা দেখেছি কিছু গুলাত (সীমালঙ্ঘন কারী), তাকফিরী ও খারেজীরা ব্যাপকভাবে মুজাহিদীনদের তাকফীর করছে এবং তাদের মুরতাদ ফতোয়া দিয়ে হত্যা করাকে বৈধ মনে করছে। এমনও হচ্ছে যে, একজন মুসলিম মুজাহিদকে মুরতাদ ফতোয়া দিয়ে হত্যা করা হচ্ছে। অথচ সে চিৎকার করে বলছে,

أشهد الاإله إلاالله وأن محمدا رسول الله

এই সীমালঙ্ঘনকারীরা বড় বড় উলামায়ে কেরামগণকে তাকফীর করছে এবং উলামাদের শিরচ্ছেদ করে তাদের মাথাকে পদদলিত করে উল্লাস করছে; উলামায়ে কেরামগণের প্রতি সামান্য শ্রদ্ধাবোধও তাদের নেই। তারা মসজিদে আত্মঘাতী আক্রমণ করছে এবং সাধারণ মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করছে; মুসলমানদের রক্তের সামান্যতম মূল্যও তাদের কাছে নেই। এই ফিতনা আজ শুধুমাত্র শাম ও ইরাকের মাঝেই সীমাবধ্য নয়, বরং তা পুরো পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করেছে। আজ পৃথিবীর সব জায়গাতেই এমন ব্যক্তিদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে যারা নিজের মতের সাথে অন্যের মতের অমিল হলেই তাকে তাকফির করে বসে এবং তাকে হত্যা করা বৈধ মনে করে। অথচ, ইসলামে একজন নির্দোষ মানুষের রক্তের মূল্য অনেক অনেক বেশি। আসুন আমরা দেখে নেই মুসলমানদের রক্তের মূল্য সম্পর্কে কুরআন ও হাদিস কী বলে। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

'যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে কোন মুসলমানকে হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম, তাতেই সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্যে ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।' (সূরা নিসা: ৯৩)

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : والذي نفسي بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا.

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সা. বলেছেন, 'ঐ সত্তার কসম করে বলছি যার হাতে আমার প্রাণ! একজন মুমিনকে (ইচ্ছাকৃত) হত্যা করা আল্লাহর তাআলার নিকট দুনিয়া ধ্বংসের চেয়েও গুরুতর।' -নাসাঈ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا

ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সা. বলেছেন, 'মুমিন বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত তার দীনের সীমার প্রসস্ততার মধ্যে থাকবে যতক্ষণ না সে কোন হারাম রক্ত প্রবাহিত করে।' -বুখারী

عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلَّا الرَّجُلُ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا أَوْ الرَّجُلُ يَمُوتُ كَافِرًا

আবু ইদরীস থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি মুআবিয়া রাযি. কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা. কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, 'আশা করা যায় আল্লাহ তাআলা সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন তবে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা কারী এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যু বরণকারীকে ক্ষমা করবেন না।' -নাসাঈ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِى الدِّمَاءِ.

আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সা. বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন সর্ব প্রথম মানুষের মাঝে রক্তের বিচার হবে।' -মুসলিম

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: ثَكِلَتْهُ أُمُّهُ: «رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّدًا، يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آخِذًا قَاتِلَهُ بِيَمِينِهِ، أَوْ بِيَسَارِهِ، وَآخِذًا رَأْسَهُ بِيَمِينِهِ، أَوْ شِمَالِهِ، تَشْخَبُ أَوْدَاجُهُ دَمًا فِي قُبُلِ الْعَرْشِ، يَقُولُ: يَا رَبِّ سَلْ عَبْدَكَ فِيمَ قَتَلَنِي؟

ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল সা. কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, 'তার মা তার জন্য ক্রন্দন করুক (অর্থাৎ সে ধ্বংস হোক) যে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন (নিরপরাধ) মানুষকে হত্যা করবে, কিয়ামতের দিন (নিহত ব্যক্তি) তার হত্যাকারীকে তার ডান হাত অথবা বাম হাত দিয়ে ধরে এবং ডান হাত অথবা বামহাত দিয়ে নিজের মাথা চেপে ধরে রক্তাক্ত অবস্থায় আরশের সামনে এসে উপস্থিত হয়ে বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক আপনি আপনার বান্দাকে জিজ্ঞাসা করুন সে কেন আমাকে হত্যা করেছিল?' -মুসনাদে আহমদ

عَنِ ابْنِ سِيرِينَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ –صلى الله عليه وسلم– « مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ.

ইবনে সীরিন থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রা রাযি. কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, আবুল কাসেম সা. (রাসূল সা. এর কুনিয়ত) বলেন, 'যে ব্যক্তি তার ভায়ের দিকে অস্ত্রের ইশারা করল, হোক না সে তার আপন ভাই; তার প্রতি ফেরেস্তারা অভিসম্পাত করতে থাকে যতক্ষণ না সে অস্ত্র সরিয়ে নেয়।' -মুসলিম

عَنْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا – (قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِي سَرِيَّةٍ فَصَبَّحْنَا الْحُرَقَاتِ مِنْ جُهَيْنَةَ فَأَدْرَكْتُ رَجُلًا فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَطَعَنْتُهُ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ فَذَكَرْتُهُ لِلنَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – : أَقَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَقَتَلْتَهُ ؟ قَالَ–قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا قَالَهَا خَوْفًا مِنَ السِّلَاحِ قَالَ : أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ قَالَهَا أَمْ لَا ؟ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي أَسْلَمْتُ يَوْمَئِذٍ :

'উসামা ইবনে যায়েদ রাযি. বলেন, রাসূল সা. আমাকে এক সারিয়াতে প্রেরণ করেছিলেন। আমরা সকাল বেলা জুহায়না গোত্রের নিকটে কিছু অঞ্চলে আক্রমণ করলাম। আমি সেখানে এক লোককে ধরে ফেললাম। অতঃপর সে لاإله إلا الله পাঠ করল। তা সত্ত্বেও আমি তাকে হত্যা করলাম। বিষয়টি নিয়ে আমি অস্বস্তি বোধ করছিলাম তাই আমি এটা রাসূল সা. এর নিকট উপস্থাপন করলাম, রাসূল সা. আমাকে বললেন, সে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়ল আর তুমি তাকে হত্যা করলে! আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল সা. সে তো অস্ত্রের ভয়ে এটা পড়েছে। তিনি বললেন, 'সে অস্ত্রের ভয়ে পড়েছে না সত্যি সত্যি পড়েছে এটা জানার জন্য তুমি কেন তার হৃদয় চিরে দেখলে না?' রাসূল সা. এটা এতোবার বলছিলেন যে, আমার মনে হতে লাগল! আমি যদি তখন মুসলমান হতাম, (অর্থাৎ পূর্বে মুসলমান না হয়ে তখন মুসলমান হলে তো আমার মাধ্যমে এ অপরাধ সংঘটিত হতো না)।

অন্য হাদীসে খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি. এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا – قَالَ : بَعَثَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ – أَحْسِبُهُ قَالَ – إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ ، فَدَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا : أَسْلَمْنَا ، فَقَالُوا : صَبَأْنَا صَبَأْنَا ، وَجَعَلَ خَالِدٌ بِهِمْ قَتْلًا وَأَسْرًا ، قَالَ : ثُمَّ دَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرًا حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ يَوْمًا أَمَرَنَا ، فَقَالَ : لِيَقْتُلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ أَسِيرَهُ . قَالَ ابْنُ عُمَرَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَاللَّهِ لَا أَقْتُلُ أَسِيرِي ، وَلَا يَقْتُلُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ ، قَالَ : فَقَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَذُكِرَ لَهُ مَا صَنَعَ خَالِدٌ ، قَالَ : فَرَفَعَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : " اللَّهُمَّ أَبْرَأُ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ

'ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সা. খালেদ রাযি. কে বনী জাযীমায় প্রেরণ করলেন। খালেদ রাযি. তাদেরকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বললেন। তারা- ইসলাম গ্রহণ করলাম- একথা ভালভাবে বলতে পারল না তাই তারা বলল, আমরা স্বধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করলাম। কিন্তু খালেদ রাযি. তাদেরকে হত্যা এবং বন্দী করলেন এবং আমাদের প্রত্যেককেই একজন করে বন্দীর দায়িত্ব দিলেন। পরদিন সকালে আমাদেরকে প্রত্যেকের কাছে থাকা বন্দীকে হত্যার নির্দেশ দিলেন। তখন ইবনে ওমর বলেন, আল্লাহর কসম আমি আমার বন্দীকে হত্যা করবো না এবং আমার সঙ্গীরা কেউ তার বন্দীকে হত্যা করবে না। তিনি বলেন, অতঃপর আমরা রাসূল সা. এর নিকট ফিরে আসলাম এবং তাঁকে খালেদ রাযি. এর বিষয়টি জানানো হল। তখন তিনি আকাশের দিকে হাত তুলে বললেন,

" اللَّهُمَّ أَبْرَأُ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ "

'হে আল্লাহ খালেদ যা করেছে আমি তার দায়িত্ব নেব না।'-বুখারী

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ –صلى الله عليه وسلم– وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يَدْرِى الْقَاتِلُ فِى أَىِّ شَىْءٍ قَتَلَ وَلاَ يَدْرِى الْمَقْتُولُ عَلَى أَىِّ شَىْءٍ قُتِلَ.

আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সা. বলেন, 'ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! মানুষের উপর এমন জামানা আসবে যখন হত্যাকারী জানবে না যে সে কী কারণে হত্যা করল এবং নিহত ব্যক্তিও জানবে না যে কী কারণে তাকে হত্যা করা হল।' -মুসলিম

সম্মানিত উপস্থিতি! উপরোক্ত আয়াত ও হাদিসসমূহ থেকে একজন মুসলিমের রক্তের মুল্য যে কত বেশি তা স্পষ্টভাবে বুঝে আসে। উল্লিখিত আয়াত ও হাদিসকে সামনে রেখেই আল কায়েদার সম্মানিত উলামায়ে কোরামগণ যুদ্ধের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতার নির্দেশ দিয়েছেন; যাতে অনিচ্ছা স্বত্ত্বে অন্যায়ভাবে একজন মুসলিমের রক্ত প্রবাহিত না হয়। আল-কায়েদার পক্ষ থেকে মসজিদ, বাজার, পরিবহনরুট, জনসমাগমের স্থান ও সাধারণ মানুষকে হামলার লক্ষ্যবস্তু বানাতে সম্পূর্ণভাবে নিষেধ করা হয়েছে এবং সন্দেহপূর্ণ যে কোন ধরনের আক্রমণ থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে; এ ধরনের সকল আক্রমণ থেকে আল কায়েদার উলামায়ে কেরামগণ নিজেদের দায়মুক্তি ঘোষণা করেছেন। শায়েখ আতিয়াতুল্লাহ আল লীবি রহ. বলেন,

فلتفني ولنفني تنظيماتنا و جماعاتنا ولايراق علي ايدينا دم امرء مسلم

'পৃথিবী ধ্বংস হোক, ধ্বংস হোক আমাদের সংগঠন, দল এবং অস্তিত্ব; কিন্তু আমাদের হাত যেন বেআইনীভাবে মুসলমানের রক্ত ঝরার কারণ না হয়।

والله يا اخي اننا قد خرجنا في هذا الطريق لنصرة هذا الدين
اننا قد خرجنا في هذا الطريق لإعلاء كلمة الله
إننا قد خرجنا في هذا الطريق لنصرة المتضعفين

'হে আমার ভাই! আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমরা এই পথে বের হয়েছি এই দীনকে সাহায্য করার জন্যে। আমরা এই পথে বের হয়েছি আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্যে। আমরা এই পথে বের হয়েছি মাজলুম মুসলমানদের সাহায্য করার জন্যে; সুতরাং আমাদের দ্বারা যাতে এই দীন ও উম্মাহর অকল্যাণ সাধিত না হয়।

تزكية النفس

আনুগত্য ও আত্মত্যাগই সফলতার সোপান

প্রথমে একটি ঘটনা পড়ি...

'সিরিয়ার রণক্ষেত্র মুসলিম বাহিনীর সর্বাধিনায়ক খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাযি. সৈন্য পরিচালনা করছেন। মদীনা থেকে খলীফা উমর রাযি.-র দূত শাদ্দাদ ইবনে আউস রাযি. খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাযি.-র পদচ্যুতি এবং সেনাপতি আবু উবাইদা রাযি.-কে প্রধান সেনাপতি মনোনয়নের চিঠি নিয়ে এলেন সিরিয়ায়। সিরিয়ার সেনাশিবিরে সকল সৈনিক ও সেনাধ্যক্ষরা উপস্থিত। খলীফার দূত শাদ্দাদ রাযি. সকলের সামনে সর্বাধিনায়ক খালিদ রাযি.-কে পদাবনতি এবং আবু উবাইদা রাযি.-কে প্রধান সেনাপতি মনোনয়নের কথা ঘোষণা করলেন। সেনা ও সেনাধ্যক্ষদের পিনপতন নীরবতা। নীরবভাবে খালিদ রাযি.-ও খলীফার নির্দেশনামার পাঠ শুনলেন। তারপর নীরবে নতমুখে তিনি সেনাপতির পদ থেকে পিছনের সারিতে গিয়ে দাঁড়ালেন। আবু উবাইদা রাযি. সামনে বেড়ে শূন্যস্থান পূরণ করলেন।

সর্বাধিনায়ক খালিদ রাযি. সাধারণ সৈন্যের সারিতে মিশে গেলেন। এই পদাবনতিতে খালিদ রাযি.-র চোখ কি ক্রোধে জ্বলে ওঠেছিলো? কিংবা অপমানে তাঁর মুখ কি লাল হয়ে ওঠেছিলো? অথবা তাঁর গন্তদ্বয় বেয়ে কি দুঃখের অশ্রু নেমে এসেছিলো? তিনি কি কয়েকজন সৈন্য নিয়ে বিদ্রোহী গ্রুপ গঠন করেছিলেন? তিনি কি তাঁর পদাবনতিতে হিংসার গন্ধ খোঁজছিলেন? তিনি কি তাঁর পদাবনতির কারণে কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করেছিলেন? না, এগুলোর কিছুই হয়নি তাঁর, এগুলোর কিছুই করেননি তিনি। বরং মরু সিরিয়ার প্রান্তর থেকে প্রান্তরে চষে বেড়ানো খালিদ রাযি.-র রোদপোড়া লাল মুখটিতে তাঁর আগের সেই উজ্জল হাসি, সেই শান্ত স্বর্গীয় নূরাণী দীপ্তি তখনো ছিলো। খলীফার নির্দেশ মেনে নেয়ার সেই সময়-ই শুধু তাঁর শির নত হয়েছিলো। তারপর তাঁর শির সেই আগের মতই উন্নত থেকেছে। সে শিরে লজ্জা অপমান কোনো স্থান পেলো না। দুঃখের কালিমাও তাঁকে স্পর্শ করতে পারলো না। তিনি পেছনের সারিতে দাঁড়িয়ে বললেন, আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর রাযি. কোনো হাবশী গোলামকেও যদি আমার নেতা মনোনীত করতেন, তবুও তাঁর আদেশ আনন্দে মেনে নিয়ে আমি জিহাদ চালিয়ে যেতাম।আর হযরত আবু উবাইদা রাযি. তো কত উঁচু পর্যায়ের লোক।'

পদাবনতির ফলে সামন্য নিরুৎসাহও কি হযরত খালিদ রাযি.-কে ঘিরে ধরেছিলো? তিনি কি উৎসাহ-উদ্দীপণা গতিবেগ হারিয়ে ফেলেছিলেন? না, কোনোটিই নয়। পদচ্যুত হবার পরমুহূর্তেই সেনাপতি আবু উবইদা রাযি.-র নির্দেশে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর রাযি.-র সাহায্যে অন্য এক রণক্ষেত্রে ছুটে যান, প্রাণপণ জিহাদ করেন, জয়ীও হন সেখানে।

এই আনুগত্য, এই আন্তরিকতা, এই নিবেদিত প্রাণের কোনো নজীর ইতিহাসে নেই। একজন প্রধান সেনাপতি দেশের পর দেশ জয় করলেন, যিনি পেলেন সৈন্য ও সেনাধ্যক্ষদের অকুণ্ঠ ভালোবাসা ও আনুগত্য; তিনি বিনাবাক্যব্যয়ে পদাবনতি মেনে নিয়ে অধীনস্ত সেনাধ্যক্ষের অধীনে সাধারণ সৈনিকের মতো পূর্বের ন্যায় একই আন্তরিকতা নিয়ে জিহাদ করছেন, নেতৃত্ব ও সামরিক শৃঙ্খলার প্রতি এমন সম্মান প্রদর্শন অসাধারণ ও বিস্ময়কর। বিস্মকর নয় শুধু তাদের কাছে যাঁরা জিহাদের ময়দানে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য লড়াই করে, ধন সম্পদ ক্ষমতা আর পদের জন্য নয়।"

এই এক টুকরো ইতিহাস পড়ে গর্বে নিশ্চয় বুক কয়েক ইঞ্চি উঁচু হয়ে গেছে? হওয়ার-ই কথা। এযে আমাদের সোনালী ইতিহাস। তাঁরা যে আমাদের পূর্বসূরী, আমরা তাঁদের উত্তরসূরী। দিবানিশী তাঁদের মতো মহা-মানুষ পাওয়ার, তাঁদের মতো মহা-মানুষ হওয়ার স্বপ্ন দেখি !

এবার একটু ভাবুন! আমরা আমাদের দাবি আর স্বপ্নের প্রতি কতটুকু দৃঢ়? আমরা কতখানি তাঁদের মতো ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত? আমরা আমাদের ব্যক্তিগত জীবন থেকে নিয়ে বৈশ্বিক জীবনে তাঁদের মতো আনুগত্য ও ত্যাগের কতটুকু নজীর স্থাপন করতে পেরেছি? আর আমাদের বর্তমান অবস্থায় এর নজীর দেখাতে পরবো বলে বিশ্বস আছে এই কথা বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবো?

হাদীসের ভাষ্যমতে ফিতনার কালো মেঘ আমাদের ছেঁয়ে ফেলেছে। অথচ আমরা 'এক উম্মাহ এক দেহ' হয়েও শতধা ভিন্ন! একটু মনের ভিন্নতায় আমরা কয়েক টুকরো হয়ে যাচ্ছি! একটু সম্মান আর ক্ষমতার লোভে হরদম আপন ভাইয়ের গোস্ত ভক্ষণ করছি! তুচ্ছ বিষয়ে বিবাদে জড়িয়ে আমরা নিঃশ্বেস হয়ে এখন প্রত্যেকে-ই অস্তিত্বের হুমকিতে! তাগুত আমাদের অবস্থা দেখে মুখটিপে হাসছে। তারা হাত তালি দিয়ে আমাদের উৎসাহ দিচ্ছে এগিয়ে যাবার। আর এটা তারা করবেই। কারণ যে কাজ তাদের সেই কাজ আমরা নিজেরাই করে দিচ্ছি। তারা আমাদের মধ্যকার মতবিরোধ কখনো শেষ হতে দেবে না। তারা ভালো করেই জানে, সকল মুসলমান যখন 'এক উম্মাহ এক দেহ' হয়ে যাবে তখন পৃথিবীর কোনো শক্তি তাদের শাসন করতে পারবে না, কোনো শক্তি তাদের পথ রুদ্ধ করতে পারবে না।

হে ভাই! সময় এসেছে নিজেকে শুধরে নেয়ার। নিজের কথা ও স্বপ্নের পূর্ণতায় দৃঢ়পায়ে এগিয়ে যাওয়ার। কসম আল্লাহর! যদি আমরা তা করতে পারি, তহলে আমাদের আর দিকে দিকে শোনতে হবে না মাজলুমানের চিৎকার, আমাদের আর দেখতে হবে না রক্তের নহর,দেখতে হবে না লাশের পাহাড়। হে ভাই! এসবের মাঝেই যে আমাদের সৃষ্টির রহস্য নিহিত। আল্লাহ আমাদের হেদায়াত দিন। আমীন

বাড়াবাড়ি পরিত্যাগ করুন তাওহীদের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হোন

শাইখ আইমান আয-জাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহ

আরব বসন্তের চাকচিক্যে যারা প্রবঞ্চিত হয়েছিল তাদের আর বুঝতে বাকি নেই যে, এই বসন্ত নির্যাতন, নিপীড়ন ও গোলযোগের নতুন দ্বার উন্মুক্ত করেছে। যার গতি-প্রকৃতি পূর্বের চেয়ে বহুগুণে তীব্র ও কুৎসিত। অশুভ শক্তির বিজয়কে তরান্বিত করে এই বসন্তের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। অথচ উম্মাহ এ আপদ থেকে মুক্তিই কামনা করেছিল।

মুসলিম জাতি আজ চরম বাস্তবতার মুখোমুখি। তারা দেখতে পাচ্ছে, যেসকল ইসলামী দল মুক্তির আশায় সেকুলারিজম, প্রজাতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রকে আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিল, যারা আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের সাথে নিজেদের ভাগ্য জুড়ে দিয়েছিল; তারা দীন ও দুনিয়া দু'টোই হারিয়েছে।

উম্মাহর সামনে আজ স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সত্যিকার মুজাহিদ ও দায়ীগণ যে সতর্কবার্তা উচ্চারিত করেছিলেন তা যথার্থই ছিল। তারা বলেছিলেন যে, দাওয়াত ও জিহাদের পথই হচ্ছে মুক্তির পথ। কোরআন-সুন্নাহ বর্ণিত পথ। বাস্তবতা ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে স্বীকৃত পথ। তাই সত্যিকার মুজাহিদ ও দায়ীগণের কর্তব্য হচ্ছে, উম্মাহর সামনে কোরআন সুন্নাহর আলোকে বিষয়টি যথাযথভাবে বর্ণনা করা। যাতে মানুষ পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে মুক্তির পথে পরিচালিত হতে পারে।

কর্তব্যের তাগিদেই মুজাহিদ ও দায়ীগণকে আরো দুটি বিষয় উম্মতের সামনে বর্ণনা করতে হবে।

১. যেসকল তানযীম দাওয়াত ও জিহাদের মাধ্যমে আল্লাহর দীনকে সমুন্নত করতে চায় তারা সর্বসাধারণকে নির্বিচারে তাকফীর করে না এবং তাকফীর করার জন্য অজুহাত খুঁজে বেড়ায় না।

২. জিহাদী তানযীম সর্বদা নবুওয়াতের আদলে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। এমন কোন শাসককে ক্ষমতায় বসানোর জন্য কাজ করে না, যিনি মুসলমানদের রক্তের বন্যা বইয়ে তাদের লাশের উপর দাঁড়িয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার স্বপ্ন দেখেন, যিনি যে কোন মূল্যে ক্ষমতার মসনদ আঁকড়ে থাকতে চান।

আমাদের বক্তব্য পরিষ্কার, আমরা খোলাফায়ে রাশেদার অনুরূপ শাসন চাই। যাকে আঁকড়ে থাকার আদেশ করেছেন স্বয়ং নবী করীম সা.। তিনি বলেন,

"أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، فَتَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ"

'আমি তোমাদেরকে তাকওয়ার উপদেশ দিচ্ছি এবং ইসলামী নেতৃত্বের শ্রবণ ও আনুগত্য করার উপদেশ দিচ্ছি, যদি কোন হাবশী গোলামও (তোমাদের আমীর নিযুক্ত) হয়। কেননা তোমাদের মধ্যে যারা (ভবিষ্যতে) জীবিত থাকবে তারা অসংখ্য ব্যাপারে মতবিরোধ দেখতে পাবে। সুতরাং তোমাদের যে কেউ সেই যুগ পাবে সে যেন আমার সুন্নাহ ও হেদায়েতের দিশারী খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নাহ দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে।'- মুসনাদে আহমদ:১৭১৮৫

আমরা খোলাফায়ে রাশেদার আদলে হুকুমত চাই। কারণ, খোলাফায়ে রাশেদার উপর সন্তুষ্ট থেকে রাসূল সা. দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ও আবু মুসলিম খোরাসানীকে আদর্শরূপে গ্রহণ করতে চাই না।

আমরা এমন শাসক চাই না যার অনুসারীরা ঝকঝকে তরবারী উঁচু করে বলে ইনি আমীরুল মুমিনীন। তার মৃত্যুর পর আমীরুল মুমিনীন হবে জনাব অমুক সাহেব। যে ব্যক্তি মানবে না তার জন্য রয়েছে এই তরবারী। আমরা এমন শাসক চাই না যার অনুসারীরা বলে, যে ব্যক্তি এই জামাআহ (শাসনক্ষমতা) নিয়ে আমাদের সাথে দ্বন্দ্ব করবে তাকে তরবারীর আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করা হবে। আমরা এমন শাসক চাই না যিনি বলেন, 'বিচক্ষণতা ও সাহসিকতা আমার হাতের চাবুক ছিনিয়ে নিয়েছে; বিনিময়ে দিয়ে গেছে ধারালো তরবারী। যার বাঁট আমার হস্তে, ফিতা আমার স্কন্ধে, আর ধারালো অংশ বিরুদ্ধাচারীর গলে। আমরা এমন শাসকও চাই না, যিনি বলবেন, আমরা এই খিলাফাহ অধিকার করেছি শক্তির মাধ্যমে, জ্বালাও-পোড়াও ও ভাঙচুরের মাধ্যমে।

দায়ীগণের কর্তব্য হচ্ছে, উম্মাহকে বুঝানো যে, ইসলামী শরীয়াহ শুরা-ভিত্তিক হুকুমত প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতি। পাশাপাশি উম্মাহর এই অধিকার রয়েছে যে, তারা নিজেদের খলীফা নির্বাচন করবেন এবং খলীফার কাছে জবাবদিহিতা তলব করবেন।

দায়ীগণের আরো একটি কর্তব্য হচ্ছে, বাড়াবাড়ি ও শৈথল্য প্রদর্শন; এই দুই প্রান্তিকতা সম্পর্কে সতর্ক করা। শৈথল্যবাদীরা শরীয়ত বিরোধী পন্থায় ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার দিবাস্বপ্ন দেখে। যেমন- মুসলিম ব্রাদারহুড ও সিসির আশী-র্বাদধন্য সালাফী আন্দোলন।

আর যারা বাড়াবাড়িতে লিপ্ত তারা কতক অপরিচিত ব্যক্তির গোপন বায়আতের মাধ্যমে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার দাবী করেছে। তারা খলীফা বানিয়েছে এমন একজনকে যাকে উম্মাহ নির্বাচন করেনি এবং তিনি তাদের সন্তুষ্টিভাজনও নন।

তারা আকস্মিকভাবে একজন খলীফা আবির্ভাবের সংবাদ পরিবেশন করল। তারা বলল, তিনি আত্মপ্রকাশ করেছেন এমন লোকদের মাধ্যমে যাদের তোমরা জান না এবং কল্পনাও করতে পার না।

তোমাদের দায়িত্ব হল তাদেরকে মেনে নেয়া এবং তার আনুগত্য করা। আনুগত্য করতে ব্যর্থদের -সে যেই হোক- প্রাপ্য হচ্ছে- একঝাঁক তাজা বুলেট, যা বিদ্ধ হবে তার মস্তকে। এমন কথা কেবল ঐ সকল লোকের মুখেই শোভা পায় যারা ক্ষমতা দখল করেছে বুলেটের মাধ্যমে। জ্বালাও-পোড়াও ও ধ্বংসযজ্ঞের মাধ্যমে।

মুজাহিদ, দাঈ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ নির্বিশেষে উম্মতের প্রত্যেকের দায়িত্ব হল, প্রচার মাধ্যমের প্রতি লক্ষ্য রাখা। এর মাধ্যমে তারা তাদের আমীরকে চেনে নেবেন। তার আদেশ-নিষেধ জেনে নেবেন। তার পক্ষ থেকে নিযুক্ত গভর্নরের পরিচয় লাভ করবেন। আর যারা প্রচার মাধ্যমের প্রতি সার্বক্ষণিক দৃষ্টি রাখল না-ফলে করণীয় বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞ থাকল; শাস্তির মুখোমুখী হলে তারা যেন অন্যকে দোষারোপ না করে। এর জন্য সে নিজেই দায়ী।

দায়ীগণের দয়িত্ব হল তারা নুবুওয়াতের আদলে প্রতিষ্ঠিত খিলাফাহ এবং বংশীয় শাসনের মধ্যকার পার্থক্য সর্বসাধারণকে ভালভবে বুঝিয়ে দেবেন। বংশীয় শাসন সম্পর্কে রাসূল সা. বলেন,

اول من غير سنتي رجل من بني أمية

‘সর্ব প্রথম যে আমার সুন্নাহকে বিকৃত করবে সে বনূ উমাইয়্যার লোক।’ [শায়েখ আলবানী রহ.। তিনি এ হাদীসটিকে হাসান আখ্যা দিয়েছেন। ছিলছি-লাতুস সাহীহাহ্:খ-৪, পৃ-৬৪৮]

প্রখ্যাত এক আলেম বলেন, সম্ভবত হাদীসের উদ্দেশ্য হচ্ছে খলীফা নির্বাচনের পদ্ধতিগত পরিবর্তনের দিকে ইঙ্গিত করা এবং উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে খলীফা নির্বাচন করা। হাদীসটিতে রাসূল সা. বলপূর্বক খলিফা হওয়ার দাবীদারকে সুন্নাহ বিকৃতকারী আখ্যা দিয়েছেন।

সুতরাং ঐব্যক্তির জন্য কি গর্ব করা সাজে যিনি জোরপূর্বক নিজেকে খলিফা দাবী করেছেন? প্রভাব বিস্তার ও জবরদখল আল মুলকুল আদূদ তথা বংশীয় শাসনের বৈশিষ্ট্য। আর এই ব্যবস্থা ‘খিলাফাহ আ'লা মিনহাজিন নুবুওয়াহ’ ভেঙ্গে পড়ার কারণ। আল্লাহ যদি চান তাহলে পরবর্তী কোন পর্বে খিলাফাতুন নুবুওয়াহ সম্পর্কে কিছু মৌলিক আলোচনা করব। আমাদেরকে অবশ্যই জানতে হবে কী কারণে খিলাফাহ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছিল।

খিলাফাহ ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা দেখার প্রত্যাশায় আমরা এই মাত্র ধড়ফড় করে ঘুম থেকে জেগে উঠিনি। অথচ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জোট সেনাদের হামলার মুখে খেলাফতের পতন ঘটেছিল। এটি ছিল বংশীয় শাসনের কুফল। যা উঁইপোকার ন্যায় উম্মাহর হাড়-মাংস খেয়ে ফেলেছিল এবং এক সময় তা বিধ্বস্ত হয়েছিল। যদি আলেম ও আল্লাহ ওয়ালাগণ না থাকতেন, মুজাহিদ ও নেককারগণ না থাকতেন তাহলে অল্প সময়ের ব্যবধানে এই উম্মাহ পরাজিত হত এবং কিছুতেই চৌদ্দশত বছর টিকে থাকতে পারত না।

ইতোপূর্বে খিলাফাহ বড় বড় শক্তির মুখোমুখী হয়েছে। সেই শক্তি বর্তমান কুফরী শক্তির তুলনায় নিতান্তই দুর্বল ছিল। কিন্তু আমরা ইতহাসের কঠিনতম ক্রুসেডীয় আক্রমণের শিকার। আজ আমরা যাদের মোকাবেলা করছি তারা অস্ত্রে-শস্ত্রে আমাদের চেয়ে হাজারগুণ বেশি শক্তিশালী। এমনিভাবে ঈমান আমল ও জিহাদের ময়দানে আমরা পূর্ববর্তীগণের চেয়ে অনেক পিছিয়ে।

সুতরাং যে সকল কারণে পূর্বে খিলাফাহ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছিল যদি সেগুলোর প্রতিকারে আমরা সচেষ্ট না হই তাহলে পূর্বের চেয়ে বড় পরাজয়ের মুখোমুখী হতে হবে।

‘আলমুলকুল আদূদ’ তথা বংশীয় শাসনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মতামত গ্রহণ না করা। স্বেচ্ছাচার, জুলুম ও মুসলমানদের সম্ভ্রমে আঘাত করা। নেক কাজের আদেশ এবং অন্যায় কাজে বাধা প্রদান নিষিদ্ধ করা। রাসূল সা. বলেছেন,

"لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الإِسْلامِ، عُرْوَةً عُرْوَةً، فَكُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ، تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا، فَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الْحُكْمُ، وَآخِرُهُنَّ الصَّلاةُ"

‘ইসলামের বিধানগুলোকে একটি একটি করে ধ্বংস করা হবে। যখনই একটি বিধান ভেঙ্গে দেয়া হবে মানুষ অন্যটি ধরে রাখার চেষ্টা করবে। এভাবে প্রথম যে বিধানাটি ভেঙ্গে দেয়া হবে তা হচ্ছে কোরআনী শাসনব্যবস্থা এবং সর্বশেষ বিধানটি হচ্ছে নামাজ।’ [আল-জামেউ সাগীর:৯২০৬]

মুসলিম উম্মাহ আজ এমন একটি যুগ পার করছে যখন দ্রুত গতিতে জিহাদের উত্থান ঘটছে। সুযোগ পেলেই তাতে ফুঁকে দেয়া হচ্ছে নতুন প্রাণ, ভিন্ন জীবন। উম্মাহ মুছে ফেলছে লাঞ্ছনা-বঞ্চনার দীর্ঘ ইতিহাস—রচনা করছে ইনসাফ ও শুরা ভিত্তিক শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস। মুসলিম ভূখণ্ডগুলোকে স্বাধীন করার ইতিহাস। মানব জাতির বিকাশ ও উন্নতির পথে এবং একটি সুস্থ মানবসমাজ বিনির্মাণে রয়েছে অনেক বাধা-বিপত্তি। এ বাধাগু-লার রকমফের। এরই ধারাবাহিকতায় নিকট অতীতে আমরা অর্জন করেছি কিছু নৈরাশ্যকর অভিজ্ঞতা। মুসলিম উম্মাহর পরামর্শ ছাড়া খিলাফতের অযৌক্তিক দাবীর কারণে শামে সংঘটিত হয়েছে ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধ। এতকিছু সত্ত্বেও সার্বিক বিবেচনায় মুসলিম উম্মাহর উন্নতি ও অগ্রগ-তির পাল্লা আজ অনেক ভারী।

ঐতিহাসিক বাস্তবতা হচ্ছে, মুসলিম উম্মাহ যখনই হোঁচট খেয়েছে তখনই নব উদ্দমে জেগে উঠেছে। দৃঢ় সংকল্প ও সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সম্মুখপানে ছুটে চলেছে। আর তাইতো গৃহযুদ্ধের পর আফগানিস্তানে ইসলামি ইমারাহ কায়েম হয়েছিল। আলজেরিয়ায় সশস্ত্র ইসলামী দল অস্ত্র ত্যাগের পর জামাআতে সালাফিয়্যাহ দাওয়াহ ও কিতালের ঝাণ্ডা উঁচু করেছে এবং মুজাহিদগণের বরকতময় কাফেলার সাথে একীভূত হয়েছে। যা আজ তানযীম আল-কায়েদা বি-বিলাদিল মাগরিব নামে পরিচিত। আল্লাহর ইচ্ছায় শামের ফিৎনা নির্মূল হওয়ার পর শামের জিহাদ নতুন মাত্রা লাভ করবে। সঠিক চিন্তা-চেতনা ও দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে শুরা ও ইনসাফ ভিত্তিক খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাবে।

বিভিন্ন দেশে ইসলামের উত্থান প্রসঙ্গে আলোচন-ার পূর্বে ইরাক ও শামের উপর ক্রুসেডীয় বাহিনীর হামলা সম্পর্কে কয়েকটি কথা না বলে পারছি না।

আমার প্রাণপ্রিয় ভাইয়েরা! ইরাক ও শামের উপর খ্রিষ্টানদের চলমান হামলা তাদের ধারাবাহিক হামলারই অংশ। যার পরিধি ফিলিপাইন থেকে পশ্চিম আফ্রিকা, চেচনিয়া থেকে সোমালিয়া ও মধ্য-আফ্রিকা পর্যন্ত এবং পূর্ব-তুর্কিস্তান থেকে ওয়াজিরিস্তান ও আফগানিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত। এটি হচ্ছে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, যাকে নাম দেয়া হয়েছে ‘সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ’।

এমনকি আজ শাম ও ইরাকে খ্রিষ্টানরা যেই হামলা করেছে তা নির্দিষ্ট কোন দলের বিরুদ্ধে পরিচালিত হচ্ছে না। এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে- জিহাদের উত্থানকে ব্যর্থ করে দেয়া। উক্ত হামলাকে এই দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখতে হবে এবং এর মোকাবেলা করতে হবে। এই হামলাকে সফল করতে শত্রুরা মতবিরোধ দূরে ঠেলে দিয়েছে। তাই এই হামলা মোকাবেলা করার জন্য আমাদেরকেও ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

ইরাক ও শামের মুজাহিদগণকে পরস্পর সহযোগিতা বিনিময়ের একটি প্রস্তাব আমি পেশ করব। তবে তার আগে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় পরিষ্কার করতে চাই। যদিও আমরা বাগদাদীর খিলাফাহকে স্বীকৃতি দেই না এবং তাকে খেলাফতের উপযুক্ত মনে করি না; তবুও তার কিছু পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্তকে সমর্থন করি। তাই যদি তারা ইসলামী বিচার ব্যবস্থা কায়েম করে তাহলে আমরা তাদের এ সিদ্ধান্ত ও কাজের সমর্থন করব; কিন্তু যদি তারা তাদের এবং অপরাপর জিহাদী তানযীমসমূহের মাঝে বিরোধ নিরসণে শরীয়তের দ্বারস্থ হতে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে আমরা তাদেরকে সমর্থন করি না।

যখন তারা কাফের নেতৃবৃন্দকে হত্যা করবে তখন আমরা তাদের পক্ষে; কিন্তু যখন তারা আবু খালেদ আস্‌সূরীকে হত্যা করে তখন আমরা তাদের বিপক্ষে। যখন তারা খ্রিষ্টান, রাফেজী ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তখন তাদের যুদ্ধকে আমরা সমর্থন করি; কিন্তু যখন তারা মুজাহিদগণের ঘাঁটি দখলের নামে তা বোমা মেরে উড়িয়ে দেয় তখন আমরা তাদেরকে সমর্থন করি না। এমনি-ভাবে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি দখলে নিতে চাইলে আমরা তাদেরকে সমর্থন করি না।

যখন তারা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবে, অথবা আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকারের জন্য সংগঠিত হবে তখন আমরা তাদের পক্ষে; কিন্তু তারা যখন মুজাহিদ ভাইদের উপর অপবাদ আরোপ করবে এবং দুর্নাম রটাবে তখন আমরা তাদের বিপক্ষে। এমনিভাবে যখন তারা আমাদেরকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী বলে সাইক্স্‌-পিক্ট এগ্রিমেন্টের সাথে সমঝোতাকারী বলে আখ্যা দেয় এবং আমাদেরকে সেই ব্যাভিচারিণীর সাথে তুলনা করে যে নয় মাসের গর্ভ লুকিয়ে রাখতে চায় তখন আমরা তাদের বিপক্ষে।

এমনকি আজ শাম ও ইরাকে খ্রিষ্টানরা যেই হামলা করেছে তা নির্দিষ্ট কোন দলের বিরুদ্ধে পরিচালিত হচ্ছে না।

এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে- জিহাদের উত্থানকে ব্যর্থ করে দেয়া। উক্ত হামলাকে এই দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখতে হবে এবং এর মোকাবেলা করতে হবে। এই হামলাকে সফল করতে শত্রুরা মতবিরোধ দূরে ঠেলে দিয়েছে। তাই এই হামলা মোকাবেলা করার জন্য আমাদেরকেও ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

যখন তারা মুসলিম বন্দিগণকে মুক্ত করে এবং জেল থেকে বের করে আনে তখন আমরা তাদের পক্ষে; কিন্তু যখন কোন কাফের বন্দীকে ইসলাম গ্রহণের পরও হত্যা করে তখন আমরা তাদের বিপক্ষে। যখন তারা আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মোহাম্মাদ ওমর মুজাহিদকে মান্য করে তখন আমরা তাদের পক্ষে; কিন্তু যখন তারা তানযীম আল-কায়েদা এবং মোল্লা মোহাম্মাদ ওমর মুজাহিদের বায়আত ভঙ্গ করে, আবু হামযা মুহাজির রহ. এর উপর মিথ্যার অপবাদ আরোপ করে এবং বলে যে, আল-কায়েদা এবং মোল্লা মোহাম্মাদ ওমর মুজাহিদের বায়আত গ্রহণের মত কোন ঘটনা পূর্বে ঘটেনি তখন আমরা তাদের বিপক্ষে।

যখন তারা যে কোন ভূখণ্ডে মুসলিম ভাইদের দিকে সাহায্যের হাত প্রসারিত করে তখন আমরা তাদের পক্ষে; কিন্তু যখন তারা শরীয়ত বহির্ভূত পন্থায় খিলাফাহ ঘোষণার মাধ্যমে মুজাহিদগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির পায়তারা করে তখন আমরা তাদের বিপক্ষে। যদি তারা শুরা ভিত্তিক খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা করতে চায় তাহলে আমরা তাদের পক্ষে; কিন্তু যদি নির্যাতন, নিপীড়ন ও হত্যার মাধ্যমে জোরপূর্বক কোন খিলাফাহ মুসলিম উম্মাহর ঘারে চাপিয়ে দিতে চায় তাহলে আমরা তাদের বিপক্ষে।

আমরা তাদের সাথে ইনসাফপূর্ণ আচরণ করব যদিও তারা জুলুম করে। আমরা আল্লাহর আনুগত্য করব, যদিও তারা আমাদের সাথে চাল-চলন ও আচরণে আল্লাহর নাফরমানী করে।

এতসব সমস্যা সত্ত্বেও ইরাক ও শামের মুজাহিদগণকে বলব, যেন তারা পরস্পরের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন এবং সমন্বিতভাবে চলমান ক্রুসেডীয় হামলার মোকাবেলা করেন। যদিও বাগদাদীর সাথে তাদের মতপার্থক্য রয়েছে এবং যদিও তারা বাগদাদীর খিলাফাহকে স্বীকৃতি দেয়নি। খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার দাবি করা এবং একে স্বীকৃতি না দেয়ার বিতর্ক এখানে মুখ্য নয়। কারণ মুসলিম উম্মাহ এখন খ্রিষ্টানদের আক্রমণের শিকার। তাই এই হামলা রুখে দিতে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।আমি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বলতে চাই, যখন খ্রিষ্টান, সাফাবী ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা মুজাহিদগণের যে কোন দলের বিরুদ্ধে -যার মধ্যে বাগদাদীর দলও আছে- যুদ্ধ ঘোষণা করে তাহলে আমরা মুজাহিদগণের সাথে থাকব।

যদি তারা আমাদের উপর জুলুম করে, আমাদের উপর মিথ্যা অপবাদ দেয়, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে, খলীফা নির্বাচনের ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহ ও মুজাহিদগণের মতামত না নেয় এবং এ ক্ষেত্রেশরয়ী ফয়সালা মেনে নিতে প্রস্তুত না থাকে তবুও আমাদের অবস্থান ও আমাদের দষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হবে না। আল্লাহর মেহেরবানী-তে আমরা মুসলিমগণকে এবং মুজাহিদগণকে সহযোগিতার কথা পূর্বেও বলেছি, এখনো বলছি।

ক্রুসেডার, সাফাবী ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের বিরুদ্ধে যখন বাগদাদী ও তার অনুসারীদেরকে সহযোগিতা করতে বলি তখন এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলি না যে, তিনি খলিফাতুল মুসলিমীন বা তিনি এবং তার অনুসারীগণ খেলাফতে রাশেদার প্রতিনিধিত্ব করছেন। শরয়ী ফয়সালা মেনে নিতে প্রস্তুত না থাকে তবুও আমাদের অবস্থান ও আমাদের দষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হবে না। আল্লাহর মেহেরবানীতে আমরা মুসলিমগণকে এবং মুজাহিদগণকে সহযোগিতার কথা পূর্বেও বলেছি, এখনো বলছি।

ক্রুসেডার, সাফাবী ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের বিরুদ্ধে যখন বাগদাদী ও তার অনুসারীদেরকে সহযোগিতা করতে বলি তখন এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলি না যে, তিনি খলিফাতুল মুসলিমীন বা তিনি এবং তার অনুসারীগণ খেলাফতে রাশেদার প্রতিনিধিত্ব করছেন। কারণ, এই দাবী অবাস্তব। প্রমাণিত নয়। মূলত ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুকে প্রতিহত করার স্বার্থে আমরা তাদেরকে সাহায্য করার পক্ষপাতি।

আমরা যখন জাবহাতুন নুসরার ভাইদেরকে সাহায্য করি তখন এই দৃষ্টিকোণ থেকে সাহায্য করি না যে, তারা আমাদের ভাই এবং তানযীম আল-কায়েদার বাইআত গ্রহণকারী; বরং তাদেরকে সাহায্য করি; কারণ তারা মুসলমান, তারা মুজাহিদ। যখন শাম ও ইরাকের মুজাহিদগণকে সাহায্য করার আহ্বান জানাই তখন তার উদ্দেশ্য এই হয় না যে, তাদের সাথে আমাদের মতের মিল রয়েছে বা মতবিরোধ রয়েছে; বরং তাদেরকে সাহায্য করার আহ্বান জানাই শরীয়তের বাধ্যবাধকতার কারণে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

'আর মুশরিকদের সাথে তোমরা যুদ্ধ কর সমবেতভাবে, যেমন তারাও তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে সমবেতভাবে। আর মনে রেখো, আল্লাহ মুত্তাকী-নদের সাথে রয়েছেন।'-সূরা তাওবা: ৩৬

আমাদের অবস্থানে কোন অস্পষ্টতা নেই। আমরা ইরাক ও শামের সকল মুজাহিদের পাশে আছি। ইসলামের শত্রুদের মোকাবেলায় তুর্কিস্তান থেকে মালি পর্যন্ত, ককেশাশের পর্বতচূড়া থেকে আফ্রিকার বনভূমি পর্যন্ত এবং ইন্দোনেশিয়া থেকে নাইজেরিয়া পর্যন্ত বসবাসকারী প্রত্যেক মুসলিম ও মুজাহিদের পাশে আছি। আমরা তাদেরকে সাহায্য করব, তাদের শক্তি যোগাব। তাতে আমাদের সাথে তাদের আচরণ ভাল হোক বা মন্দ।

তারা আমাদের উপর জুলুম করুক বা ইনসাফপূর্ণ আচরণ করুক। মোট কথা, কোন অবস্থাতেই আমাদের এই অবস্থান পরিবর্তন হবে না। কিন্তু শরয়ী ফয়সালাকে পাশ কাটানো, মুসলমানদেরকে নির্বিচারে তাকফীর করা, তাদের উপর মিথ্যা অপবাদ দেয়া, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, মুজাহিদগণের ঐক্য বিনষ্ট করা এবং মুসলমানদের পবিত্রতা ও মান-সম্ভ্রমে আঘাত করার ক্ষেত্রে আমরা তাদেরকে সমর্থন দেব না।

শাম ও ইরাকে অধিকাংশ মুজাহিদ এবং সারা বিশ্বের মুজাহিদগণের ব্যাপারে আমরা ভাল ধারণা পোষণ করি। আমাদের বিশ্বাস, তারা ঘর থেকে বের হয়েছেন আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে, শরীয়াহ ও খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নুবওয়াহ পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। দোআ করি আল্লাহ তাআলা তাদের নেক আমলসমূহ কবুল করুন। তাদের গুনাহ মাফ করুন এবং তাদেরকে দান করুন দুনিয়ার মর্যাদা ও আখেরাতের সফলতা।

এমনিভাবে আমরা মনে করি, যে সকল জিহাদী তানযীমের মাধ্যমে ফাসাদ সৃষ্টি হচ্ছে তাদের সকলেই এর জন্য দায়ী নয়। বরং গুটিকতক মানুষ এর জন্য দায়ী, যারা সত্য-মিথ্যাকে গুলিয়ে ফেলেছে। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদের এবং তাদের পাপসমূহ ক্ষমা করেন। সরল পথে পরিচালিত করেন এবং ঐক্যবদ্ধ করে দেন।

ইসলামী বসন্ত থেকে সংগহিত

শরীয়ত ব্যতীত যুদ্ধ ফেতনা বৈ কিছু নয়

■ মাওলানা আসেম ওমর হাফিজাহুল্লাহ

হে আমার মুজাহিদ ভাইয়েরা ! তোমরা যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবেসে নিজেদের অতি মূল্যবান ও শ্রেষ্ঠ সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় কুরবানি করছো এবং আখেরাতের জীবনকে দুনিয়ার জীবনের উপর প্রাধান্য দিচ্ছ।

হে যুবক ভাইয়েরা! তোমরা যারা এই উম্মাহর সম্মান রক্ষার জন্য নিজেদের সবকিছু কুরবানি করার সংকল্প করেছো। কোন সন্দেহ নেই তোমরা যে পথে চলছো তা এক মহান-মর্যাদাপূর্ণ পথ এবং ইসলাম ও উম্মাহর সম্মান ও গৌরবের পথ, আর এটাই ইসলামের শীর্ষ চূড়া এবং চিরসুখের ঠিকানা জান্নাতের সংক্ষিপ্ত পথ। এটা শুধু মুসলমানদেরই নয় বরং কাফেরদের জন্যও হেদায়েতের পথ।

এই ওয়াজিব আদায়ের মাধ্যমে শুধু মুসলমানরাই নয় বরং সমস্ত মানুষ এই নষ্ট শাসন-ব্যবস্থার অত্যাচার থেকে রক্ষা পাবে এবং ইসলামী শাসন-ব্যবস্থার মাধ্যমে সারা দুনিয়া নিরাপদ থাকবে।

কিন্তু এখন প্রশ্ন হল; কেউ কি ইমামুল মুজাহিদীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সা. এর দেখানো পথ অনুসরণ না করে, শরীয়তের বিধিবিধানের কোন পরোয়া না করে, মন যেভাবে চায় সেভাবেই জিহাদ করতে পারবে? এবং নিজের চাহিদা মত মানুষের রক্ত ঝরাতে পারবে এবং মানুষ হত্যা করতে পারবে? আর এভাবে কি উম্মাহর সম্মান বৃদ্ধি পাবে? এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও জান্নাত লাভ করা সম্ভব হবে ?

আমার প্রিয় ভাই ! না, এভাবে সম্ভব না। কারণ জিহাদ একটি ইবাদত। আর এমন ইবাদতই আল্লাহ তাআলার নিকট গ্রহণ যোগ্য যা পরিপূর্ণভাবে শরীয়তের অনুসরণ করে হালাল-হারাম ও জায়েয-না জায়েযের রেয়ায়েত করে আদায় করা হয় অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সা. এর তরীকা মত আদায় করা হয়। বিষয়টি এমন নয় যে, যুদ্ধের ময়দানে প্রত্যেক যোদ্ধা এবং আহত বা নিহত ব্যক্তিই মুজাহিদ !!

সুতরাং মনে রাখতে হবে প্রত্যেক মুসলমানের উপরই শরীয়তের উপর চলা ফরজ। কেউ এর বাইরে নেই এমনকি মুজাহিদগণও না। বরং তারাই এর বেশী হকদার। রাসূলুল্লাহ সা. এরশাদ করেন,

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ

'হালাল' স্পষ্ট এবং 'হারাম' স্পষ্ট। এদুয়ের মাঝে রয়েছে মুশাব্বাহাত তথা সন্দেহ যুক্ত বিষয়। অনেক মানুষই তা জানে না। যে ব্যক্তি সন্দেহ যুক্ত বিষয় থেকে বেঁচে থাকল সে তার দ্বীন ও সম্মান হেফাজত করল। আর যে সন্দেহ যুক্ত বিষয়ে পতিত হল তার উপমা হল ঐ রাখালের মত যে রাখাল তার পশুকে ক্ষেতের আশপাশে চরাতে থাকে এবং খুব সম্ভাবনা আছে সেগুলো সীমানার ভেতরে ঢুকে পড়বে। মনে রাখবে প্রত্যেক মালিকেরই একটা সীমানা রয়েছে আর আল্লাহর সীমানা হল নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ।

সুতরাং হে মুজাহিদ ভাই! নিষিদ্ধ কাজ থেকে তখনই বেঁচে থাকা সম্ভব হবে, যখন সন্দেহ পূর্ন বিষয় থেকে বেঁচে থাকবে বরং তার নিকটে যাওয়ারও চেষ্টা করবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি তাবীল ও ভুল ব্যাখ্যার মাধ্যমে এর নিকটে যাওয়ার চেষ্টা করবে কোন এক দিন সে নিষিদ্ধ বিষয়েই পতিত হবে। চাই এর নাম জিহাদ অথবা এস্তেশহাদী দেওয়া হোক না কেন। মনে রাখবে! আল্লাহ তাআলা অমুখাপেক্ষী। তাঁর এমন জিহাদের কোনই প্রয়োজন নেই যেখানে নিষিদ্ধ কাজ করা হয় এবং হারাম রক্ত প্রবাহিত করা হয়।

হে মুজাহিদ ভাইয়েরা ! আমাদের বুঝে আসুক বা না আসুক, আমরা মানতে পারি বা না পারি, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা. জিহাদের ময়দানে যে সকল বিষয় নিষিদ্ধ করেছেন তা থেকে বেচে থাকার মধ্যেই জিহাদের কল্যান ও কামিয়াবি নিহিত রয়েছে।

শরীয়ত যেটাকে হক বলেছে সেটাই হক আর যেটাকে না- হক বলেছে সেটাই না-হক এবং তা মানার মধ্যেই কামিয়াবি। তাবীল ও ভুল ব্যখ্যার কোন সুযোগ নেই।

যেমন, যে সকল নারী ও শিশু যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেনি তাদের হত্যা করতে রাসুলুল্লাহ সা. নিষেধ করেছেন। এখন কেউ যদি এই আদেশের বিপরীত তাবীল করে বলে যে, আমি যদি শত্রুর স্ত্রী-সন্তান এবং পরিবার-পরিজনকে হত্যা করি তাহলে শত্রু ভীত-সন্ত্রস্ত হবে, মানুষিক-ভাবে ভেঙ্গে পড়বে এবং যুদ্ধ করার মত মনবল হারিয়ে ফেলবে। এবং একথা বলে নারী ও শিশু হত্যা শুরু করে তাহলে সে এটা করতে পারবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এটাই তার নাকেছ আকল ও সল্প অভিজ্ঞতার প্রমান। মানুষের প্রকৃতি আর মানসিকতা সম্পর্কে তার সামান্য পরিমাণও ধারণা নেই।

মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে তোমার যদি সামান্য ধারণাও থকতো তাহলে বুঝতে পারতে যে, নারী ও শিশু হত্যার কতটা প্রভাব মানুষের মধ্যে পড়ে ! এবং নবী সা. এর হাদীসের সত্যতা সম্পর্কে তোমার ঈমান আর বৃদ্ধি পেত এবং তুমি বুঝতে পারতে যে, যুদ্ধক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ স. এর মূলনীতি বর্তমান আধুনিক যুদ্ধেও ঠিক ততখানিই কল্যানকর যত খানি কল্যাণকর ছিল চৌদ্দশত বছর আগে।

একটু ভেবে দেখ কোন দৃশ্যটা তোমাকে বেশী কষ্ট দেয় এবং তোমার মধ্যে ক্রোধ ও ঘৃণা সৃষ্টি করে, কোন নিহতপুরুষের লাশের দৃশ্য, নাকি নারী ও শিশুর ক্ষতবিক্ষত দেহের দৃশ্য?

মনে রখো ! নারী ও শিশুর রক্তাক্তদেহ ও তাদের ক্ষতবিক্ষত লাশের দৃশ্য মানব হৃদয়ে ঘৃণা ও ক্রোধের আগুন জ্বেলে দেয়। এবং সবচেয়ে ভীতু আর কাপুরুষ লোকটাকেও প্রতিশোধের দৃঢ় সংকল্পী করে তোলে। তুমি কি দেখনি? অতিদুর্বল নারীও সন্তানের জন্য মহা বিপদে ঝাপ দেয়!!

অবশ্যই নারী ও শিশুর রক্ত যুদ্ধেক্ষেত্রে শত্রুর সংখা বৃদ্ধি করে এবং যুদ্ধের প্রতি শত্রুর ইচ্ছাকে আরো প্রবল করে তোলে।

সুতরাং তুমি যদি এটা বুঝে থাক যে, যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেনি এমন নারী-শিশুর রক্ত জনমনে ক্রোধ আর প্রতিশোধের আগুন জ্বালিয়ে দেয়। তাহলে অন্য একটি হাকীকতও বুঝে নাও যে, আল্লাহ তাআলা রাসূল স. কে যুদ্ধের আদেশ দিয়েছেন, যাতে করে শত্রুর যুদ্ধ করার মনোবল হারিয়ে যায় এবং তার যুদ্ধের সংকল্প ভেঙ্গে পড়ে।

আর একারণেই আল্লাহ তাআলা শত্রুর বড় বড় নেতৃস্থানীয়দের হত্যা করে তাদের মনবল ভেঙ্গে দেয়ার আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَقَاتِلُوٓا۟ أَئِمَّةَ ٱلْكُفْرِ

সুতরাং তোমরা কাফেরদের নেতাদের হত্যা কর। অর্থাৎ তোমরা উচ্চপদস্থ কমন্ডারদের সাথে যুদ্ধ কর। অতপর এর উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলেছেন

لعلهم ينتهون

যাতে করে তারা বিরত থাকে অর্থাৎ ইসলাম ও শরীয়তের বিরুদ্ধে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকে।

ইমাম আবু সাউদ রহ. এই আয়াতের ব্যখ্যায় বলেন 'কাফেরদের বিরুদ্ধে তোমাদের যুদ্ধের উদ্দেশ্য যেন হয় তাদেরকে কুফরি এবং বড়বড় অপরাধ থেকে বাঁচিয়ে রাখা। তোমাদের উদ্দেশ্য যেন তাদেরকে কষ্ট দেওয়া বা তাদের ক্ষতি করা না হয়। অর্থাৎ তোমরা ঐ সব যোদ্ধাদের মত হয়ো না, যারা জাহেলি মনোভাবের কারণে শত্রুকে কষ্ট দেওয়ার চেষ্টা করে, শত্রুকে কষ্ট দেওয়া ব্যতিত তাদের আর কোন উদ্দেশ্য বা টার্গেট থাকে না। বরং তোমাদের যুদ্ধের উদ্দেশ্য যেন হয় সাহাবায়ে কেরাম রাযি. দের মত 'শত্রুদের গর্দান কাটার মাধ্যমে তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল শরীয়ত কায়েমের প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করা 'যাতে করে সাধারণ মানুষের সামনে হেদায়েতের দরজা খুলে যায় এবং তারা সন্তুষ্ট চিত্তে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করতে পারে।"

সুতরাং আমরা কমান্ডার ও নেতৃবর্গের উপর ধারাবাহিক আক্রমণের মাধ্যমে শত্রুর যুদ্ধের ইচ্ছাকে শেষ করে দিব এবং তাদের শিকড় উপড়ে ফেলব। যাতে করে তাদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ে এবং তারা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালাতে শুরু করে আল্লাহর শোকর ইতিমধ্যেই আফগানিস্তানে আমরিকা ও তার মিত্রদের মনবল ভেঙ্গে পড়েছে।

মনে রাখবে গেরিলা যোদ্ধা তার উদ্দেশ্যে তখনই সফল হয় যখন সে তার শত্রুর মনোবল ভেঙ্গে দিতে সক্ষম হয়। সমস্ত শত্রু হত্যার মাধ্যমে বিজয় অর্জন হয় না। বিজয় অর্জন হয় শত্রুর মনোবল ভেঙ্গে দেয়ার মাধ্যমে। আল্লাহর রাসুল সা. এর সিরাত দেখ, বদরের যুদ্ধে সকল কাফেরকে হত্যা করা হয়নি। বরং মক্কার বেশির ভাগ কাফেরই তো জীবিত ছিল। কিন্তু তারা পরাজিত হয়েছে, কারণ তাদের নেতা আর সর্দাররা নিহত হওয়ার মাধ্যমে তাদের ঐ মনোবল ভেঙ্গে গিয়েছিল যার গর্ব করে তারা মক্কা থেকে বের হয়ে ছিল। তোমরা রাসূল সা. এর সিরাত পড়ে দেখ। মক্কা বিজয়ের দিন আরবের সকল কাফেরকে হত্যা করা হয়নি বরং যোদ্ধা ও বিদ্রোহী প্রায় সকল কুরাইশই বাকি ছিল কিন্তু তাদের মনোবল ভেঙ্গে তারা পরাজিত হয়ে ছিল। অনুরুপ ভাবে আফগানিস্তানে সোভিয়েত ইউনিয়ন পরাজয়ের সময় তাদের সকল সৈন্য নিহত হয়নি বরং তাদের যুদ্ধরত সৈন্যদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ে ছিল। বর্তমানেও আফগানিস্তানে আমরিকা ও তার মিত্ররা তাদের সকল ড্রোন ও জঙ্গিবিমান ধ্বংস হওয়া এবং তাদের সকল সৈন্য নিহত হওয়ার কারণে পরাজয় উপহার পায়নি। বরং আল্লাহর ইচ্ছায় তাঁর সিংহরা শত্রুর মনোবল ভেঙ্গে দিয়েছে এবং তাদেরকে কঠিন ক্ষতির মধ্যে ফেলেছে, ফলে তারা এখন এতটাই ভীত-সন্ত্রস্ত যে, তারা ক্যাম্প আর দুর্গের ভেতর থেকে ড্রোন আর বিমানের সাহায্যেও তালেবানদের সাথে যুদ্ধ করতে সাহস পায় না। সুতরাং বুঝা গেল যুদ্ধে বিজয় অর্জন হয় শত্রুর মনবল ভাঙ্গার মাধ্যমে। নারী-শিশু হত্যার করে শত্রুর মনোবল ভাঙ্গা যায় না বরং তা আরো বৃদ্ধি পায় এবং তার প্রতিশোধের সংকল্প দৃঢ় হয়। আর এটা শুধু শত্রুর ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে না বরং এ কারণে নিরপেক্ষ লোকগুলোও শত্রুর পক্ষে চলে যায়। এবং যুদ্ধে শত্রু সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। অথচ রাসূল সা. যুদ্ধে শত্রুসংখ্যা কমাতে চেষ্টা করতেন। শত্রুর মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে তাদের দুর্বল করেছেন। তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করেননি।

হে আমার মুজাহীদ ভাইয়েরা! তোমরা প্রিয় নবী সা. ও তাঁর অনন্য সাধারণ সেনাপতিদের জিহাদ থেকে শিক্ষা গ্রহন করে সর্ব প্রথম নিজেদের টার্গেট ঠিক কর। যুদ্ধক্ষেত্রে সঠিক টার্গেট নির্ণয় সময়ের সৎ ব্যবহার আর প্রয়োজনীয় আসবাব গ্রহন যুদ্ধের ফলাফলে

অনেক প্রভাব ফেলে। যুদ্ধে ঐ ব্যক্তিই বিজয় অর্জন করে যে যুদ্ধের চাকা নিজের হাতে রাখে। আর যুদ্ধের চাকা ঐ ব্যক্তির হাতেই থাকে যে আশপাশের যুদ্ধ দেখে প্রভাবিত না হয়ে নিজের টার্গেট অনুযায়ি আগে বাড়ে।

কোন 'বিদ্রোহ' বল প্রয়োগ দ্বারা দমন হয় না। বল প্রয়োগ তো বিদ্রোহকে আর বাড়িয়ে দেয়। বরং তার ব্যাপারে ভয় হলো সে তার আসল টার্গেট থেকে সরে না যায়। ইতিহাস দেখ, কোন আন্দোলনই শক্তির মাধ্যমে দমানো যায়নি বরং দমানো হয়েছে মূল টার্গেট থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে। সুতরাং যুদ্ধের চাকা নিজের হাতে রাখতে হবে। যুদ্ধের চাকা নিজের হাতে থাকলে প্রয়োজন মত যুদ্ধকে যেদিক খুশি সেদিক নিতে পারবে। যখন প্রয়োজন পড়বে যুদ্ধের মাত্রা বাড়িয়ে দিবে আবার প্রয়োজন মত কমিয়ে দিবে। ফলে শত্রুর ইচ্ছা না থাকলেও তোমার পরিকল্পনা অনুযায়ী ময়দানে আসা যাওয়া করতে বাধ্য হবে। আর এভাবেই এক সময় তাদের মনোবল ভেঙ্গে পড়বে। বিজয়ী সেনাপতি শত্রুকে নিজ ইচ্ছা মত যুদ্ধের মইয়দানে টেনে আনে। কিন্তু যে সেনাপতি যুদ্ধের নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে সে যুদ্ধে বিজয়ী হবে তো দূরের কথা বরং শত্রুর হাতের খেলনায় পরিণত হবে। আল্লাহ তাআলা সূরা আনফালে সঠিক টার্গেট নির্ণয়, সময়ের সৎ ব্যবহার এবং মুনাসেব উপকরণ ব্যবহারের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন

فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ

তোমরা শত্রুর গর্দানে আঘাত কর এবং তাদের প্রত্যেক জোড়ায় জোড়ায় আঘাত কর। -সুরা আনফাল : ১২

উক্ত আয়াতে প্রথমে সঠিক টার্গেট নির্ণয়ের পর শত্রুর গর্দানে আঘাত করে তার ঘাড়ের রগ কাটার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যাতে সময়ও বাঁচে এবং সরঞ্জামও কম খরচ হয়। কিন্তু শত্রু যদি শক্তিশালী হয় আর তার গর্দান পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব না হয়। তাহলে তুমি তার শরীরের এমন এক স্পর্শ কাতর স্থান নির্নয় কর যেখানে মাত্র একটি আঘাতেই সে ধরাশায়ী হয়ে যায়।

তিনি বলেন,

وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ

তোমরা তাদের জোড়ায় জোড়ায় আঘাত কর। -সুরা আনফাল:১২

আর যদি তোমাদের টার্গেট হাত হয়ে থাকে তাহলে হাতের জোড়ায় আঘাত কর যাতে এক আঘাতেই তা অচল হয়ে পড়ে। আর যদি টার্গেট বাহু হয় তাহলে কাধের জোড়ায় আঘাত কর যাতে এক আঘাতেই তা অচল হয়ে পড়ে। আর এর মাধ্যমে তুমি অল্প কষ্টে এবং অল্প সময়ে সর্বোত্তম ফল লাভ করতে পারবে।

সুতরাং যে ব্যক্তি নিজ সময় ও শক্তিকে সঠিক ভাবে কাজে লাগায় সে অল্প সময় এবং অল্প উপকরণেই নিজ টার্গেটে পৌঁছতে পারে। রহমাতুল্লিল আলামীন সা. এর সিরাত দেখ, ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য তিনি সর্ব প্রথম আরবের সুপার পাওয়ার যাদের হাতে আরবের ধর্মীয়, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক নেতৃত্ব ছিল তাদের টার্গেট করেছেন। এবং অল্প সময় এবং কম উপকরনের মাধ্যমে নিজ টার্গেট সফল করেছেন অর্থাৎ জাযিরাতুল আরবের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় রাজনৈতিক এবং সামরিক শক্তির অধিকারী মক্কার কাফেরদের যুদ্ধের মনবল ভেঙ্গে দিয়েছেন।

প্রিয় নবী সা. এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে মুহসিনুল মিল্লাত মুজাদ্দেদুল জিহাদ শাইখ শহীদ উসামা রহ পৃথিবীর কুফরি শক্তিকে গুড়িয়ে দেওয়ার জন্য কুফরি নেজামের মোড়ল আমরিকাকে প্রথম ও প্রধান টার্গেট বানিয়ে ছিলেন এবং এই টার্গেট পূর্ণ করার জন্য সময় ও সরঞ্জামের সৎ ব্যবহার করেছেন। ফলে তিনি পেন্টাগন আর ওয়াল্ড ট্রেড সেন্টারে আক্রমণ করে, মহান আল্লাহর তাওফীকে কত কম সময় এবং কম সরঞ্জামের মাধ্যমে শুধু আমরিকার নয় বরং পুরা পৃথিবীর ইতিহাসই পাল্টে দিয়েছেন এবং সমগ্র পশ্চিমা বিশ্বের অহংকার মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছেন। শাইখ উসামা রহ. এর মানহাজ অনুসরণ করে শাইখ আইমান আয-জাওয়াহেরী হাফি. এর নেতৃত্বে সারা দুনিয়ার মুজাহীদগন আমরিকাকেই তাদের প্রধান টার্গেটে রেখেছে। আল্লাহর অনুগ্রহে যার ফলে পৃথিবীর ইতিহাসই আজ পাল্টে যাচ্ছে। ভেল্কিবাজ-জাদুকরদের হাত থেকে ক্ষমতার ডুরি ছুটে যাচ্ছে, বর্তমানে অবস্থা এই দাড়িয়েছে যে, তারা এশিয়ার ডুরি ধরতে চাইলে আফ্রিকার ডুরি হাত থেকে ছুটে যাচ্ছে। আফরিকাকে গুরুত্ব দিতে গেলে ইউরোপে মালির মত ছোট ছোট রাষ্ট্র আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে আমরিকাকে চোখ রাঙ্গানো শুরু করে।

এটাতো সেই আমরিকা যার এক ধমকে পারমানবিক শক্তি সম্পন্ন জেনারেল পর্যন্ত অস্ত্র ফেলে দিত!! কিন্তু আজ সে পেরেশান। কি করবে ঠিক করতে পারছে না। সে কি আফ্রিকা যাবে আল-কায়েদার হাত থেকে আফ্রিকাকে রক্ষা করার জন্য? না ইয়েমেনে ছুটে আসবে তার অনুগত দাসদের হেফাজত করার জন্য। আর আজ আফগানিস্তানে আন্তর্জাতিক জোট শক্তি আধুনিক কালের সবচে নিকৃষ্ট পরাজয়ের সম্মুখিন। অন্যদিকে শুধুমাত্র যুদ্ধের আগুন প্রজ্বলিত করা ব্যতিত শামের জন্য তাদের কোন পরিকল্পনাই বুঝে আসছে না। আল-জাযায়ের, মারাকেশ, লিবিয়া ও ভারত উপমহাদেশ নিয়ে তারা কিছু ভাবারই সুযোগ পাচ্ছে না।

আমার প্রিয় মুজাহিদ ভাইয়েরা ! আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে এটা ঐ পরিকল্পনারই ফল যা শাইখ শহীদ উসামা রহ. কুফরি শক্তিকে পরাজিত করার জন্য গ্রহন করে ছিলেন। আর শাইখের পর শাইখ আইমান আয-জাওয়াহিরী হাফি. হেকমতের সাথে এই পরিকল্পনাকে শুধু জারিই রাখেননি বরং এই মানহাজকে বিকৃতির হাত থেকেও রক্ষা করেছেন। আলহামদু লিল্লাহ আজ শুধু আমরিকাই নয় বরং পুরা পশ্চিমা বিশ্বই আজ নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ছে। তাদের জীব-দর্শন ধ্বংস হতে শুরু করেছে। এখন তো পশ্চিমারাও এই পচা দুর্গন্ধময় জীবন-ব্যবস্থা ছুড়ে ফেলে মুহাম্মদ সা. এর জীবন-ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য নিজেদের জীবন পর্যন্ত বিলিয়ে দেওয়া শুরু করেছে।

হে মুজাহিদ ভাইয়েরা! শরীয়ত প্রতিষ্ঠার এই জিহাদকে শরীয়তের পথ থেকে সরিয়ে দিবেন না। ভুলে যাবেন না, জিহাদের আসল ও প্রধান টার্গেট হল কুফরী-নেজাম ও তার রক্ষাকারীরা। একটু বুঝার ও জানার চেষ্টা করুন যে, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক শাসন-ব্যবস্থা কিভাবে চলছে ? তার মুল ভিত্তি কোনটি? এর প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন কোনটি ? কারা এই শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করছে ? এবং কার মূল্য এই শাসন-ব্যবস্থায় টিস্যু পেপারের চেয়ে সামান্যও বেশী নয়? এটা ভালভাবে জেনে তাদের জোড়ায় জোড়ায় এবং গিরায় গিরায় আঘাত করুন।

এমন আঘাত করুন যেন গোপন মোর্চা থেকেও চিৎকারের আওয়াজ শুনা যায়। বাজার, স্কুল-কলেজ এবং সাধারণ মানুষের সমাবেশে আক্রমণ করে নিষ্পাপ রক্ত ঝরিয়ে শহীদানদের এই পথকে কলুষিত করবেন না।

জেনে রাখবেন, জিহাদ একটা এবাদত আর এবাদত যদি রহমাতুল্লিল আলামীন সা. এর দেখানো পথ অনুযায়ী না হয় তাহলে দুনিয়াও বরবাদ, আখেরাতও বরবাদ। এক মাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য রাসূলে কারীম সা. এর জীবনি পড়ুন। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ুন। শুধু কোন একটি ঘটনা শুনে তাঁর পুরা জীবনি মনে করে বসবেন না। এ বিষয়টা ভালভাবে বুঝার চেষ্টা করুন যে, রাসুল সা. কোন স্থানে কোন পন্থা অবলম্বন করেছেন। সম্মিলিত শক্তিকে কিভাবে প্রতিহত করা হয় এবং কখন ময়দান লাশে পূর্ণ করার মাধ্যমে উপকৃত হওয়া যায় ? এবং কখন এহসান ও ক্ষমার মাধ্যমে চূড়ান্ত ফল অর্জন করা যায় ? আপনারা যদি বিষয়টি আরও ভালভাবে এবং সহজভাবে বুঝতে চান তাহলে আপনাদের মার্কাজসমূহে ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর বিখ্যাত কিতাব 'আস-সিয়ারুল কাবীর' পড়া শুরু করে দিন। বিশেষ করে এর 'আমান' অধ্যায়টা। কেননা এই অধ্যায়টি আপনাকে জিহাদের খুলাছা এবং জিহাদের মাধ্যমে শরীয়তের মাকছাদ বুঝিয়ে দেবে। অনুরুপভাবে শাইখ আইমান আয-জাওয়াহিরী হাফি. এর কিতাব 'ফুরসান তাহতা রায়াতিন নাবী সা.' পড়া বাধ্যতামূলক করে দিন। এতে শাইখ তার জীবনের জিহাদী অভিজ্ঞতার সার সংক্ষেপ একত্র করেছেন যা দুনিয়ার সকল মুজাহিদের জন্যই অনেক বড় পাথেয় সরূপ। আপনারা জিহাদের মাধ্যমে আপনাদের কাজ তথা শরীয়ত প্রতিষ্ঠার এবং আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার দাওয়াতকে সুসজ্জিত করে তুলুন। জিহাদের মাধ্যমে আপনাদের টার্গেট বাস্তবায়ন করুন। জিহাদকে বিকৃত করবেন না। আপনার মুখাতাব যেন আপনাদের এই মহান জিহাদের মাঝে এবং দুনিয়ার প্রচলিত রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যুদ্ধের মাঝে পার্থক্য করতে পারে। দুইটাকে এক মনে করে না বসে। এমন কি আপনার আনসার যিনি সকল সমস্যায় আপনার পাশে থাকেন সে যেন এ প্রশ্ন করতে বাধ্য না হয় যে, সাধারণ মানুষ এবং স্কুল-কলেজের ছাত্রদের রক্ত প্রবাহিত করে আপনারা কোন শরীয়ত প্রতিষ্টা করতে চাচ্ছেন??

আমার প্রিয় মুজাহিদ ভাই! এই জিহাদী আন্দোলন আমাদের উত্তরাধীকারী সম্পত্তি নয় (যে, যেভাবে খুশি সেভাবে ব্যবহার করবো) বরং এটা আমাদের গর্দানের উপর হাজারও শহীদের রক্তের আমানাত যাদেরকে শত্রুর বোমা ও মিসাইল ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। এবং এটা আমাদের উপর ঐ সকল বন্দী মুজাহিদ ভাইদের আর্তনাদের ঋণ যা তাদের মুখ থেকে টর্চার সেলের গহীন থেকে কষ্ট ও নির্যাতনের কারণে বের হয়েছে যে আর্তনাদের আওয়াজ আল্লাহ ব্যতীত আর কার কানে পৌঁছে না এবং এটা ঐ সকল বিধবা বোনদের 'আহ' শব্দের ঋণ যা পৃথিবীতে শরীয়ত প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের অন্তর থেকে বের হয়ে আবার সিনার মধ্যেই দাফন হয়ে যায়। মনে রাখবেন এই জিহাদী আন্দোলন আমাদের উপর ঐ সকল এতিম-অবুঝ শিশুদের নিষ্পাপের বোঝা যাদের পিতারা এই আশা নিয়ে হাসতে হাসতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে নিয়েছে যে, তাদের মুজাহিদ সাথীরা এই জিহাদের মধ্যে কোন ধরণের ক্ষতি পৌঁছতে দিবে না এবং এর সাথে গাদ্দারি করবে না। আল্লাহর ওয়াস্তে একটু বুঝার চেষ্টা করুন।

আপনারা সোয়াত থেকে ওয়াজিরিস্তান পর্যন্ত মুহাজির মুজাহিদদের পরিত্যাক্ত এলাকাগুলো এবং তাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত ঘর-বাড়ীগুলোর দিকে একটু লক্ষ করুন এবং শরীয়তের মোহাব্বতে আপনাদের সাথে হিজরত করা হাজার নারী-শিশুর দিকে একবার তাকান।

আপনারা এই জিহাদকে নিজের হাতে ধ্বংস করবেন না, আল্লাহর ওয়াস্তে শহীদানের রক্তের সাথে গাদ্দারি করবেন না। দুশমন তো চায় যে, আপনাদের এমন টার্গেটের দিকে ফিরিয়ে দিবে যাতে জনসাধারণ আপনাদের বিপক্ষে চলে যায় এবং আপনাদের আনসারগন এবং মুহিব্বীনগন আপনাদের অপছন্দ করা শুরু করে।

হাকিমুল উম্মত শাইখ আইমান আয-জাওয়াহিরী হাফি. তার কিতাব 'ফুরসান তাহতা রায়াতিন নাবী সা.' বইয়ে বিষয়টিই উল্লেখ্য করেছেন 'জন সাধারণের সমর্থন ও সাহায্য-সহযোগিতা ছাড়া গেরিলা যোদ্ধা ডাকাতে পরিণত হয় এবং সে বেশী দিন টিকতে পারে না।' অর্থাৎ গেরিলা যোদ্ধা হতে হলে জন সাধারণকে পাশে রাখতে হবে অন্যথায় তার অবস্থা ঐ ডাকাতের মত হবে যে জন সাধারণ থেকে দূরে লুকিয়ে থাকতে বাধ্য হয় এবং এমন গেরিলা যোদ্ধা বেশী দিন টিকে থাকতে পারে না। কেননা গেরিলা যোদ্ধা সর্ব প্রথম এক জন দায়ী, সে মানুষের অনুভূতিকে জাগ্রত করবে এবং নিজ টার্গেটের প্রতি জনসমর্থন তৈরী করে লোক একত্র করবে। এবং জনসাধারণের অন্তরে বিদ্রোহের বীজ বপন করবে।

আল্লাহ তাআলা এক দিকে রাসূল সা. কে এই আদেশ দিয়েছেন যে

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ

আপনি একাই আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করেন অন্য কারো দায়িত্ব আপনার নেই।-সুরা নিসা: ৮৪

অর্থাৎ কেউ যুদ্ধের জন্য বের হোক বা না হোক, আপনাকে একাই যুদ্ধ করতে হবে। কিন্তু জিহাদকে জারি রাখার জন্য মুমিনদের জিহাদের দাওয়াত দিন এবং তাদের জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করুন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ

মুমিনদেরকে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করুন। - সুরা নিসা: ৮৪

সুতরাং 'তাহরীদ' তথা উদ্বুদ্ধ করা ব্যতীত জিহাদ হবে না। একারণেই আপনি যত বড় শক্তির অধিকারীই হোন না কেন, আপনার সালতানাত যত শক্তিশালীই হোক না কেন এবং আপনার কাছে যত বেশী যুদ্ধাস্ত্র থাক না কেন আপনি যদি আপনার মুখাতব তথা সাধারণ মুসলমান থেকে আপনার সম্পর্ক ছিন্ন করেন তাহলে আপনি সফল হতে পারবেন না। সুতরাং যুদ্ধ জারী রাখার জন্য জন সাধারণের পক্ষ থেকে সাহায্য সহযোগিতার কোন বিকল্প নেই। আর একারণেই গেরিলা যোদ্ধাদের মোকাবিলায় গোয়েন্দা সংস্থাগুলো সর্ব প্রথম যে কাজটি করে তাহল 'গেরিলাদের মাধ্যমে এমন কোন কাজ করানো, যার উপর ভিত্তি করে সাধারণ জনগণকে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায়। অথবা তারা নিজেরাই এমন কোন কাজ করে যার অপবাদ গেরিলা মুজাহিদদের উপর দেওয়া যায়। আর জনসাধারণ এই আন্দোলনের প্রতি খারাপ ধারণা করতে শুরু করে। আমার প্রিয় ভাই ! বিষয়টি বুঝার চেষ্টা করুন, মুজাহিদ তো শুধু একটি ব্যাথা, একটি চিন্তা এবং একটি ফিকির নিয়ে ঘর থেকে বের হয়েছে। আর তাহল নিজের জান কুরবানি করে মহান রবের সন্তুষ্টি অর্জন করবে। নিজের সম্মানকে বিলিয়ে দিয়ে নবী কারীম সা. এর দীনের সম্মান রক্ষা করবে। নিজেদের আরাম আয়েশকে বিলিয়ে দিয়ে উম্মাহর আরাম আয়েশের ব্যবস্থা করবে।

সুতরাং যে ব্যক্তি 'আল্লাহর কালিমা' উঁচু করার জন্য যুদ্ধ করে সেই আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদ। হ্যা শত্রুরা আপনাদের প্রতি যে জুলুম করেছে আপনাদের স্ত্রী-সন্তান আর মা-বোনদের উপর যে নির্যাতন চালিয়েছে এবং আপনারা যে বিপদ ও মুসিবতের সম্মুখিন হয়েছেন নিঃসন্দেহে তা যদি পাহাড়ের উপরও রাখা হত তাহলে পাহাড় ধসে পড়ত। তা সত্বেও নফসের খাহেশাত অনুযয়ী অন্তরের প্রতিশোধের আগুন নিভানোর নাম জিহাদ নয়। বরং উতলে উঠা জযবাকে শরীয়তের রশি দিয়ে বাঁধার নামই হচ্ছে জিহাদ।

আপনারা শত্রুর নীচুতা এবং তার হীন ও নিকৃষ্ট মন মানসিকতার দিকে লক্ষ করবেন না যে, তারা আমাদের নিস্পাপ শিশুদের হত্যা করে আমাদের ঘরে আক্রমণ করে আমাদের স্ত্রীদের গ্রেফতার করে এবং আমাদের ঐ সকল নিকট আত্মীয়দের জেলে ভরে রাখে জিহাদের ক্ষেত্রে আমাদের সাথে যাদের কোন সম্পর্কই ছিল না। এবং আমাদের সাথে যাদের সামান্য সম্পর্ক ছিল এমন লোকদেরও গ্রেফতার করে। কিন্তু আপনারা এরকম হতে পারবেন না।

জিহাদ ও যুদ্ধের মাঝে এবং দুনিয়ার ধনসম্পদের জন্য নিজের জীবন ধ্বংসকারী এবং আল্লাহর শরীয়ত বাস্তবায়নের জন্য জীবন উতসর্গকারী মুজাহিদের মাঝে এটাই তো পার্থক্য। ইসলামের বিরুদ্ধে দেশ ও মাটির জন্য লড়াইকারী সৈন্যবাহীনি সর্বদাই অপরাধ ও দুষ্কর্মে লিপ্ত হয় কিন্তু যে ব্যক্তি দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে চায় তার আখলাক যুদ্ধ চলাবস্থাতেও কোন পরিবর্তন হয় না।

হে আমার মুজাহিদ সাথীরা ! শত্রুরা জিহাদী দাওয়াতের প্রচার প্রসার থামাতে ব্যর্থ হয়ছে কিন্তু তারা থেমে নেই। তারা যে কোন উপায়ে জিহাদকে বিকৃত করতে চাচ্ছে। এর জন্য তারা বিভিন্ন দেশে মুজাহিদদের নামে এমন কিছু ঘটনা ঘটাচ্ছে যার কারণে মানুষ জিহাদ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এমন ঘটনা না শরীয়ত সেটাকে সমর্থন করে, না সুস্থ বিবেকবান কেউ সেটাকে মেনে নিতে পারে।

সুতরাং আমাদের সতর্ক হতে হবে এবং জিহাদ ও তার 'ছামারাকে' রক্ষা করার ফিকির করতে হবে। জিহাদ তো জারী রাখতে হবে এবং সর্বাবস্থায় জারী রাখতে হবে। কিন্তু সেটা হতে হবে একেবা-রে স্পষ্ট পদ্ধতিতে যতটা স্পষ্ট ভাবে প্রিয় নবী সা. রেখে গেছেন। যার উপর সাহাবায়ে কেরাম রাযি. চলেছেন। তাঁরা কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন এবং শরীয়ত অস্বীকার কারীদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করেছেন। এক্ষেত্রে তারা অলস ও দুর্বল হয়ে পড়েননি এবং কোন ধরণের নতি স্বীকারও করেন নি। কিন্তু তারা স্পষ্ট ও মজবুত শরয়ী দলীল ব্যতীত কোন ধরনের তাবীল ও ভুল ব্যাখ্যা করে কারো জান-মাল হালাল করেননি।

সাহাবা কেরাম রাযি. দের পদাঙ্কন অনুসরণ করে মুজাদ্দেদুল জিহাদ মুহসিনুল মিল্লাত শাইখ শহীদ ওসামা বিন লাদেন রহ. উম্মতে ইসলামিয়ার সামনে জিহাদী দাওয়াতকে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল করে পেশ করেছেন এবং মুজাহিদীনদের জিহাদের স্পষ্ট টার্গেট দিয়েছেন যার ফলে আল্লাহ তাআলা সারা দুনিয়াতে এই দাওয়াতকে এমন ভাবে কবুল করেছেন যে, আজ ইসলামী বিশ্বে জিহাদের আওয়াজ শুধু উঁচুই হচ্ছে।

শাইখ উসামা রহ. এর এই দাওয়াত আফগানিস্তানের পাহাড় থেকে বের হয়ে ইয়ামান, শাম, ইরাক, সোমালিয়া, আল-জায-ায়ের এবং মারাকিশ (মাগরিবুল ইসলাম) পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

হে ভাই ! যদি এই জিহাদকে মাকবুল বানাতে চাও, জিহাদের আওয়াজকে যদি ছড়িয়ে দিতে চাও এবং শত্রুকে যদি ব্যর্থ ও পরাজিত করতে চাও তাহলে জিহাদের ঐ দাওয়াত ও মানহাজকে গ্রহণ কর যার উপর চলে আমদের পূর্ববর্তীগণ সফল হয়েছেন। আল্লাহ তাআলা ইমারতে ইসলাম আফগানিস্তানকে সম্মিলিত কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে বিজয় দান করেছেন। কিন্তু তারা না স্কুল-কলেজ ধ্বংস করেছেন না বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া কোন সাধারণ মুসলমানের রক্তে নিজেদের হাত রঞ্জিত করেছেন। বরং নিজেদের দৃষ্টিকে সর্বদা স্পষ্ট টার্গেটের দিকে নিবদ্ধ রেখেছেন। এবং ঐসকল লোকদেরকে তাদের চুরান্ত টার্গেট বানিয়েছেন যাদেরকে কুরআন জোড়ায় জোড়ায় এবং গিরায় গিরায় আঘাত করতে বলেছে। তাদের গলার রগ কেটে দিয়েছেন এবং আলহামদুলিল্লাহ এমন ভাবে আঘাত করেছেন যে, আফগানিস্তান ছড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছে।

আল্লাহর শরীয়তের উপর চললেই আমাদের জিহাদ সফল হবে। আমরা শরীয়তের যে আওয়াজ তুলেছি সর্বপ্রথম ঐ শরীয়তকে আমাদের নিজেদের উপর বাস্তবায়ন করতে হবে। আমাদের মেশিনগান, কামান ও ফিদায়ী আক্রমণকে শরীয়তের তা'বে বানাতে হবে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা যদি আমাদের কথা ও কাজের মধ্যে মিল না পান যেমন আমরা ইসলামাবাদ এবং দিল্লী-তে ইসলাম প্রতিষ্ঠার শ্লোগান দেই অন্যদিকে নিজেদেরকেই ভুলে যাই। তাহলে এগুলো তো মুখ থেকে কথার আকৃতিতে বের হওয়া কিছু শব্দ মাত্র। আমাদের হাত যদি মুসলমানদের রক্তে রঞ্জিত হয় তাহলে আল্লাহর সন্তুষ্টি তো দূরের কথা বরং তাঁর গজব আমাদের উপর পতিত হবে।

হে আল্লাহ !আপনি আমাদেরকে আপনার সন্তুষ্টি অনুযায়ী জিহাদ করার তাওফিক দান করুন এবং আমাদের এই জিহাদকে সফল করুন এবং ব্যর্থ হওয়া থেকে রক্ষা করুন। আমিন ইয়া রাব্বাল আলামীন

"পৃথিবী ধ্বংস হোক, ধ্বংস হোক আমাদের সংগঠন, দল এবং অস্তিত্ব;
কিন্তু আমাদের হাত যেন বেআইনীভাবে মুসলমানের রক্তঝরার কারণ না হয়।"

SHEIKH ATIYYATULLAH AL LIBI [R.]

যিনি পৃথিবীকে তাওহীদ শেখালেন

শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ আল লীবি রহ.

তাওহীদের এ পাঠ এখনও চলমান..... তবে, তাওহীদের এসকল পাঠের সাথে প্রচলিত পাঠের যে একদমই মিল নেই....

আরব শায়েখগণ যখন আমাদের সিরিয়াসভাবে দরস দিচ্ছিলেন: আশআরী, মাতুরিদীগণ বিদআতী, ভন্ড; ঠিক সে সময় শায়েখ উসামা বিন লাদেন তাঁর অনুসারীদের শেখাচ্ছিলেন— ব্যবসা-বাণিজ্য! তবে এ ব্যবসা সাহাবী আব্দুর রহমান বিন আউফ রাযি. উদ্ভাবিত– সাধারণ কোন ব্যবসা নয়। এ সওদা মহান রবের সাথে! ক্রেতা যেখানে আল্লাহ; কতো মহান সে ব্যবসা! অন্যদিকে আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মোহাম্মদ ওমর এক দীর্ঘ ও উন্মুক্ত সেমিনারে ভাষণের প্রস্তুতি নিচ্ছেলেন। যার শুভ সূচনা ঘটতে যাচ্ছে ৯/১১-এ। চলবে কতক্ষণ পর্যন্ত তার নির্দিষ্ট কোন সময় নেই। হতে পারে এর পরিসমাপ্তিই ঘটবে না!

ভাষণের বিষয়— তাওহীদ: মর্ম ও বাস্তব জীবনে এর প্রায়োগিক সমন্বয়।

বছরের পর বছর আমরা গলদঘর্ম হয়েছি— মাতুরিদী আর আশায়েরাদের বেদআত ও ভ্রান্তি অন্বেষণে। শুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাসের ফেরী করেছি। এর মধ্যেই ঘটল ১১ সেপ্টেম্বর উপাখ্যান।

যা আমাদের 'পূর্বপাঠ'কেই যেন বুড়ো আঙ্গুল দেখাল। বিবেককে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে বলল– যা পড়েছো; তা পুনঃপাঠ কর! আচ্ছন্ন কাটতেই আমরা আবিষ্কার করলাম— 'আরে! যাদের এতদিন 'মাতুরিদী' বলে ঘৃণায় রি রি করেছি, এরাই দেখছি 'তাওহীদ' আমাদের চে' ঢের ভালো বুঝেন!

৯/১১ ট্র্যাজেডি আমাদের চিন্তার জগৎটাই যে উন্মুক্ত করে দিল। মন বলে উঠল– 'যাকে এতদিন ইসলাম হিসেবে জেনে তুষ্ট ছিলে; ইসলামের সীমানা আরো বিস্তৃত!!

এ ঘটনা আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে বুঝিয়ে দিল– 'তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত' নিয়ে যে দ্বন্দ্বে পড়ে আছো, প্রকৃত অর্থে এর মর্ম আরো গভীর ও বাস্তববাদী। জানতে পারলাম, 'তাওহীদুল ইবাদাহ'ই হচ্ছে মূল বিষয়—বাস্তব জীবনের সাথে যার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। বুঝতে পারলাম 'তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত' উপলব্ধির সঠিক পথ ও পন্থা কী হওয়া উচিৎ!

হ্যাঁ, তালেবানই আমাদের নতুন করে সে শিক্ষা দিলেন; যা ইতোপূর্বে আমাদের মাথায় আসেনি।

তালেবান যখন বামিয়ানমূর্তি অপসারণ করল তখনও অনেকে তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দিহান ছিল! কারণ (তাদের ভাষায়) এরাতো মাতুরিদী! অনেকের বুঝে আসেনি যে— তালেবান বৌদ্ধমূর্তি ভেঙ্গেছে তাওহীদের পর্বতপুরুষ শায়েখ হামূদ বিন শা'বী রহ.-র পদাঙ্ক অনুসরণ করেই। তাওহীদ অন্বেষী প্রাথমিক স্তরের কেউ পূর্ব বিশ্বাস পরিত্যাগ করতে বড়সড় ধাক্কার মুখোমুখি হবে— এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনাটি সত্যিই বিরাট এক পরীক্ষা ছিল! ইমামুল মুজাহিদীন, আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মোহাম্মদ ওমর রহ.-র 'তাওহীদুল আমালী'র দরস শুরু হয়ে গেল।

'উদ্বোধনী ভাষণ: 'পৃথিবীর বুকে আকাশ আছড়ে পড়লেও কোন মুসলিমকে আমরা কাফেরদের হাতে তুলে দেব না'.. 'আল্লাহ আমেরিকার চে' বড়, শক্তিমান; তিনিই আমাদের সহযোগী'.. 'আমেরিকা যা ইচ্ছে করুক, আমরা আল্লাহর রজ্জুকেই আঁকড়ে থাকবো..' 'আল্লাহই সাহায্যকর্তা–এ বিশ্বাস থেকে কেউ আমাদের টলাতে পারবে না।' এরপর তাঁর সেই যুগান্তকারী হিরকতুল্য উক্তি সব কিছু আলোতে ভাসিয়ে দিল। —'আমি দুটি প্রতিশ্রুতির দিকে তাকিয়ে আছি: আল্লাহর প্রতিশ্রুতি; বুশের ভবিষ্যদ্বানী। নিঃসন্দেহে আল্লাহর প্রতিশ্রুতিই চিরসত্য, আর বুশের প্রতিশ্রুতি হওয়ায় মিলিয়ে যাবে। আল্লাহ যা চান তার ভিন্ন কিছু ঘটানোর সাধ্য কারো নেই।' আল্লাহু আকবার! এ কি মোল্লা ওমর ভাষণ দিচ্ছেন, না আবু বকর সিদ্দীক রাযি.?

এ ভাবেই আমীরুল মুমিনীন মোল্লা ওমর আমাদের তওহীদের মর্ম বুঝাতে লাগলেন; বরং 'তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাতের' মর্মও ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন। 'তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাতে'র দরসগুলো থেকে আমরা এমনটাই বুঝতাম যে, আকীদাগত মাসআলাগুলো ভালোভাবে শেখা ও তোতাপাখির মতো বলতে পারাই হল এর উদ্দেশ্য। 'আমরা ঈমান আনি আল্লাহর ওপর সে-ভাবেই যেভাবে স্বয়ং আল্লাহ নিজের পরিচয় দিয়েছেন; কোন রকম ব্যাখ্যা, সামঞ্জস্যবিধান বা কর্মহীন করা ব্যতীত'– এটাকে আমরা বাধাগৎ-এর মতই মুখস্ত করতাম। তবে প্রকৃত অর্থে আমরা 'তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাতের মূল উদ্দেশ্য বুঝতে ব্যর্থ হয়েছি। আমরা বুঝিনি আল্লাহ নিজেকে পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়, সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা বলে আমাদের থেকে কীসের স্বীকারোক্তি নিতে চাচ্ছেন।

আমরা ভুলে থাকলাম, আমাদের প্রকৃত সমস্যাগুলো কী? —অবশ্যই যার মধ্যে জিহাদই ছিল সবচে' গুরুত্বপূর্ণ। অথচ আমরা জিহাদ ছেড়ে দিলাম; কিন্তু আশআরী ও মাতুরিদীদের সাথে ইবনে তাইমিয়ার ইলমী বিতর্ক ধরে থাকলাম না শুধু একেবারে এতে মজে গেলাম! সব বাদ দিয়ে একেই দীনি কাজ বানালাম। অথচ, আমাদের বোঝা উচিৎ ছিল, উম্মাহর সবচে' বড় সমস্যাটি হল— পুরো মুসলিম উম্মাহ আজ পশ্চিমাদের আগ্রাসনের শিকার। আমাদের প্রথম কাজ হবে আগ্রাসী শত্রুর বিরুদ্ধে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করা। সে কালে আল্লাহ তাআলার 'জাত ও সিফাত' নিয়ে নানা মহল 'তা'তিল বা তাভীল' –অপব্যাখ্যা ও অক্ষমতা' আকীদা পোষণ করলে এবং বিষয়টি মারাত্মক আকার ধারণ করলে ইবনে তাইমিয়া রহ. তার বিরুদ্ধে সোচ্চার ভূমিকা পালন করেন। তবে এও কিন্তু ঐতিহাসিক সত্য যে, তিনি এতে ধ্যানমান এক করে পড়ে থাকেন নি; বরং যখন তাতারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার ডাক পড়ল, তখন তিনি মুসলিম ফৌজের সামনে সামনেই ছিলেন। হ্যাঁ, এটাই ধ্রুব সত্য কথা। একালের স্বঘোষিত ইবনে তাইময়ার শিষ্যরা কোথায়? তারা তো উল্টো 'জিহাদ'কে 'কথিত মাসলাহাতের' দোহাই দিয়ে পরিত্যাগ করে বসে আছে। এমনকি যারা আকীদা সংক্রান্ত বিষয়কে প্রথম কাজ বিবেচনা করেন, তারাও জানেন না 'আকীদা' কি ভাবে অর্জন ও ধারণ করতে হয়।

এরা মনে করেন, আশায়েরা বা অন্যান্যদের সাথে রীতিমত তর্কযুদ্ধে জড়ানোই জীবনের মূল কাজ! অথচ 'আসমা ওয়াস সিফাত' নিয়ে তাদের সাথে এ বিরোধ নিস্পত্তির সঠিক সুন্দর পন্থা কী হবে তা ভাবারও আমাদের সদিচ্ছা নেই।

তেতো শোনালেও বলি, আমাদের 'তাওহীদ শিক্ষা' প্রাচ্যবিদদের কুরআন-সুন্নাহ গবেষণারচে' বেশি কিছু নয়। তাদের অনেকে আমাদেরচে' ভালো জ্ঞান রাখে হাদীস সম্পর্কে। এর চর্চাও করে; তবে ইসলাম গ্রহণ করে না।

আপনি যখন বলবেন, 'আমি বিশ্বাস করি আল্লাহ তাঁর শান-মান অনুযায়ী সর্বশ্রোতা' এ বলাই কি যথেষ্ট? কিছুতেই নয়! এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হতে হবে; আর এটা তখনই হবে— যদি আপনার চলন-বলনে তার প্রভাব বিরাজ থাকে! আপনার কথা কাজ আল্লাহ প্রত্যক্ষ করছেন;এ উপলব্ধি সক্রিয় থাকে।

যিনি বলবেন, 'আমি বিশ্বাস করি আল্লাহ সর্বদ্রষ্টা তার মতো করে। সাদৃশ্যবাদী, অপব্যাখ্যাকারী ও কল্পবিলাসীদের আমি প্রত্যাখ্যান করি। অথচ, তার যাবতীয় কর্মকাণ্ডে আল্লাহর ভয়; তিনি সব কিছু দেখছেন, লিপিবদ্ধ করছেনে– এ উপলব্ধি জগরুক থাকবে না, তাহলে কথা–কাজের গড়মিল কি হয় না? এমনি ভাবে, 'আল্লাহ সর্বময় ক্ষমতার অধিপতি– মুখে এ বুলি কপচালে কী হবে, যদি বাস্তবে আমেররিকাকে আল্লাহর চে' শক্তিধর বিশ্বাস করে। 'আল্লাহ সম্পদশালী/অভাবমুক্ত' এটা বলে বলে মুখে ফেনা তুললে কী হবে; যদি মনে থাকে—রিজিকের ভান্ডার সাউদ বংশের হাতে। কিংবা, বিশ্ব সমস্যার সমাধান দাতা আমেরিকা। যিনি মনে করেন, 'আল্লাহ তাআলা 'সর্বজ্ঞানী', অথচ সর্বক্ষণ নিজস্বার্থ সিদ্ধির ফন্দি-ফিকির করেন। তাগুত শাসকদের নেক নজর পাবার জন্য হেন কাজ নেই যা করেন না।

সুতরাং যাদের 'মাতুরিদীয়্যাহ' বলে কটাক্ষ করা হচ্ছে, তারাই যখন প্রকৃত অর্থে আল্লাহর আসমা ও সিফাতের রঙে নিজেরা যেমন রঙিন হয়েছে, এ বোধ বক্ষে ধারণ করেছে এবং এ আপ্তবাক্যের শিক্ষা অন্যদেরও দিয়েছে।

সর্বোপরি, আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, সর্বময় ক্ষমতাবান, শক্তিমান, পরাক্রমশালী, সম্পদশালী, রিজিক দাতা, প্রজ্ঞাময় ও তাঁরই দিকে সব কিছুর প্রত্যাবর্তন— এ অটুট বিশ্বাসের বাস্তবায়নে তারা নিরাপোষ; তাহলে তাঁরাই তো 'তাওহী-দবাদী'। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-র মর্ম তাদের মধ্যেই ফুটে ওঠে। হ্যাঁ, এটাই বাস্তবসত্য। এবার নিন্দুকেরা যা ইচ্ছে বলে বেড়াক। বরং তারাই তাওহীদের মর্মের সঠিক ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন। কথিত সালাফীদের চাতুর্যতা এখানে মার খেয়েছে—যারা মুখে তাওহীদের কথা বলে আর কাজের বেলায় ঠনঠন তারা এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন বৈকি!

ঈমানের প্রশ্নে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচে' কঠিন স্তর, যা পেরিয়েই তবে তাওহীদ সমহিমায় মূর্ত হয়; পক্ষান্তরে যে স্তরে এসে মুনাফেক-কর নেফাক প্রকাশ হয়ে পড়ে তা হল—প্রবৃত্তি ও সম্পদের মোহনীয় মায়া। কারণ, এক্ষেত্রে অপশন দুটি: হয় সম্পদ ও প্রবৃত্তির নগদ তুষ্টি, অথবা মহান রবের সন্তুষ্টি– এ দুইয়ের যে কোন একটি বেছে নিতে হবে; তৃতীয় কোন পথ নেই। হয় আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিতে হবে অথবা ত্যাগ স্বীকারে ব্যর্থ হবে। আর বান্দা তখনই আল্লাহর পথে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে সক্ষম হবে, যখন ঈমান ও বিশ্বাসের বলে সে বলীয়ান হবে। সে অনুভব করবে মৃত্যু নয়, প্রভূর সাথে মিলিত হওয়ার জন্যই সে দুনিয়া ছাড়ছে। এ ঈমানের ও বিশ্বাসের অলৌকিক ক্ষমতা বলেই সাহাবী উমাইর বিন হাম্মাম রাযি. বলতে পেরেছিলেন— ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার ও জান্নাতের মাঝে কি এ খেজুরগুলোই বাঁধা নয়? এগুলোই তো আমাকে পরকালের নেয়ামতরাজি লাভে বিলম্ব ঘটাচ্ছে। আল্লাহর শপথ! এ সময়ও আমার কাছে অতিদীর্ঘ!!

যিনি নিজের জান-মাল বিত্ত-বৈভব সবকিছু আল্লাহর রাহে বিলিয়ে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করেন তিনিই প্রকৃত তাওহীদের অনুসারী। আর যিনি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পুরো রাজ্যই পরিত্যাগ করেন তার 'একাত্ববাদের' স্তরতো কল্পনার উর্ধ্বে। ইনিই হলেন আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মোহাম্মদ ওমর, আর এ হল তাঁর তাওহীদের যুগান্তকারী দরস।

সে দিনগুলো সত্যি অত্যন্ত জটিল ছিল, যখন আফগানিস্তানের শীর্ষ পর্যায়ের পাঁচ হাজার আলেম একত্র হয়েছিলেন। আমী-রুল মুমিনীন তাদের ডেকেছেন অতি স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে পরামর্শ করার জন্য।

পরামর্শের বিষয়: উসামা বিন লাদেন। পুরো বিশ্বের সবচে' আলোচিত ব্যক্তি। পশ্চিমারা যে কোন মূল্যে যাকে পেতে চায়! তবে, শীর্ষ আলেমদের এ বৈঠক এ উদ্দেশে ছিল না যে, তাঁকে পশ্চিমাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে কি না? বরং পরামর্শের বিষয় ছিল– তিনি কি এখানেই থাকবেন, না তাকে অনুরোধ করা হবে যেন তিনি আফগানিস্তান ত্যাগ করেন।

সে দিনগুলো আপনাদের মনে আছে কিনা কে জানে! সে তিনদিন ছিল বিশ্বের কোটিপ্রাণ মুমিনের জন্য শ্বাসরুদ্ধকর! শঙ্কা ছিল না জানি এমন কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যা মুমিনদের মর্মপীড়ার কারণ হয়। তবে, আল্লাহর রহমতে দুশ্চিন্তার আঁধার কেটে প্রভাতরবি জ্বলে ওঠে। ওলামা পর্ষদ সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত দেন যে, 'আমীরুল মুমিনীন এ ক্ষেত্রে নির্ভার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এতে আমরা শরয়ীতবহির্ভূত কিছু দেখছি না। এ পরামর্শ পাবার পর আমীরুল মুমিনীন শায়েখ উসামার আফগা-নস্তানে অবস্থানকেই প্রাধান্য দেন।

আমীরুল মুমিনীনের কাছে নানা কিসিমের দেশীয় বিদেশী লোকজন এসে আবেদন করত– যেন তিনি শায়েখ উসামাকে আফগানিস্তান থেকে বিতাড়িত করে দেন; তাহলেই ল্যাঠা চুকে যাবে। কিন্তু তিনি বড় আশ্চর্য জবাব দিতেন। কুরআনের বাণী শুনিয়ে দিতেন,

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

'আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মুমিন হও, তবে তোমরাই জয়ী হবে।' [সুরা আল ইমরান: ১৩৯]

আমার বিশ্বাস! ইতিহাসের পাতায় এর নজির খুঁজে পাওয়া যাবেনা। ইসলামের প্রথম খলীফা আবু বকর রাযি. এর পর মোল্লা ওমরই প্রথম ব্যক্তি যিনি আবু বকরের মতো অকল্পনীয় সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছেন। মোল্লা ওমর এ কঠিন পরীক্ষায় শুধু সফলভাবে উত্তীর্ণই হননি;বরং ঈর্ষণীয়ভাবে এ সংকট মোকাবেলা করেছেন। ইতিহাসে এমন ঘটনা খুঁজে পাওয়া যাবে না যে, একজন মাত্র ব্যক্তির কারণে পুরো রাষ্ট্র বা সাম্রাজ্য হাতছাড়া হয়েছে। বরং উল্টো বহু ঘটনা খুঁজে পাওয়া যায় যে, নানা ছুতোয় মুসলিম শাসকগণ শরয়ী শাসন প্রতিষ্ঠায় গড়িমসি করেছেন। দীনি ভ্রাতৃত্ববোধ রক্ষা করতে গিয়ে পুরো রাষ্ট্র হাতছাড়া করা—এর জুড়ি খুঁজে পাওয়া যাবে না। ইতিহাস ঘেঁটে দেখুন, এ সত্য অস্বীকারের সুযোগ নেই।

মোল্লা ওমর পুরো বিশ্বকে তাওহীদের এ বাস্তব শিক্ষাটাই দিলেন। একদম ফ্রী ফ্রী। আমরা একরত্তি খরচ করেও যা করতে পারলাম না মোল্লা ওমর পুরো দেশ অকাতরে কোরবান করে ঈমানের সে অনুপম শিক্ষাটুকুই স্থাপন করলেন।

না, শুধু মোল্লা ওমরই নন, তালেবানের প্রতিজন সদস্যই যেন তাওহী-দের, ঈমানের শীর্ষচূড়ায় আরোহী। তালেবানের পতনের পর মোল্লা আব্দুস্ –সালাম জাইফকে যখন প্রশ্ন করা হল– 'আপনাদের অবস্থানের/দৃষ্টিভঙ্গির কারণে এখন কি আপনারা অনুতপ্ত?

তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে স্পষ্ট করে বললেন, 'কখনোই নয়। আমরা যা করেছি, শরয়ী বিধান হিসেবেই করেছি। নিজেদের সাধ্যের সবটুকু উজাড় করে দিয়েছি। এমন ঘটনার যদি পুনরাবৃত্তি ঘটে, তাহলে আমাদের অবস্থান এমনই হবে; সামান্য হেরফেরও হবে না।'

তাওহীদের কথিত ফেরিওয়ালাদের এর থেকে শেখার আছে বৈকি! এদের নামের পাশেই 'ইমাম' উপাধিটি মানায়, এঁরাই এর প্রকৃত হকদার। কারণ ইমাম হওয়ার জন্য অবশ্যই ধৈর্য ও অটুট বিশ্বাস প্রয়োজন, আর এ সকল অতিমানবরা ধৈর্য ও বিশ্বাসের যে উপমা স্থাপন করেছেন—তার তুলনা হয় না!

ইখতিলাফি/মতবিরোধপূর্ণ মাসআলায় ভূমিকা কেমন হবে তালেব-ানরা আমাদের সে শিক্ষা ভালোভাবেই দিলেন। নিজেদের জান-মাল, বসত-ভিটা উজাড় করে বুঝিয়ে দিলেন তাওহীদের অবিচ্ছেদ্য অংশ 'ওয়ালা বারা' তথা 'বন্ধুত্ব ও শত্রুতার নীতি কী হওয়া চাই।

এতোদিন যে সব মজলিসে আমরা আশায়েরা ও মাতুরিদিয়াদের বেদআতী বলে ঢেকুর তুলতাম, ৯/১১ এর পর সে আমরাই অকপটে বলতে শুরু করলাম—তালেবানদের ভালোবাসা ঈমানের অংশ; মুনাফেক, রাফেজী কিংবা কাফের ছাড়া অন্য কেউ তাদের প্রতি বিদ্বেষী হতে পারে না।

এ হল তাওহীদের কার্যকরী পাঠ; যার সূত্রে মহান আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের সামনে সুপ্রমাণিত করে তোলেন— কারা সত্য ও নিষ্ঠাবান আর কারা অসত্য ও স্বার্থান্ধ। ফলে আমরা দেখতে পাই সে সময়ে একদল জ্ঞানপাপী নিজেদের নামের পাশে 'লম্বা লম্বা ডিগ্রী ও অভিধা জুড়ে মহান পন্ডিতের পরিচয় জাহির করেন; তাদেরই আবার দেখতে পাই আল্লাহর শরীয়তকে পরিবর্তনকারী তাগুত শাসকদের সামনে জ্বি হুজুর এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। অথচ, এ সকল তাগুতরা দীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। অভিশপ্ত ইহুদী আর পশ্চিমা মোড়লদের গোলামী করা সৌভাগ্য মনে করে।

তারপর সে দরবারী আলেমদেরই আমরা যখন দেখি– তালেবানদের আকীদা-বিশ্বাস নিয়ে বড় গলায় কথা বলতে; বেদআতী, বেদআতী বলে মুখে ফেনা তুলতে। তখন সঙ্গত কারণেই তাদেরকে প্রশ্ন করার ইচ্ছা জাগে– তাঁরা যদি একমাত্র আল্লাহর জন্য, তার দীনের জন্য সর্বস্ব বিলিয়েও পরিশুদ্ধ বিশ্বাসী হতে না পারে; তাহলে আপনাদের মতো তাগুতের পদলেহীদের ঈমান কী করে এতো উত্তুঙ্গে নিবাস করে? যারা এ যুগেও ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার নজিরবিহীন উপমা স্থাপন করে; তাদের গালমন্দ করে ইহুদী-খ্রিষ্টানদের বাহবা কুড়ানোই বুঝি খাঁটি তাওহীদ!

ঠিক এর বিপরীত চিত্র আমরা দেখতে পাই যাদের মাতুরিদী, বেদআতী বলে নাক সিঁটকানো হত তাদের মধ্যে। আশ্চর্য! দেশীয় তাগুতদের সম্মুখে সত্য কথা বলতে যার আত্মা কাঁপে, সেখানে আল্লাহর আশ্চর্য সৃষ্টি তালেবানরা এ সকল পুঁচকি তাগুততো ছাই; বিশ্বমোড়ল আমেরিকার চোখে আঙ্গুল দিয়ে বলে ওঠে- 'কখনোই আমরা একজন মুসলিমকে তোমাদের হাতে তুলে দিব না; আকাশ ভেঙ্গে পড়লেও না।' সুবহানাল্লাহ!

বলুন, এটাইকি প্রকৃত তাওহীদ নয়? যা আমাদের বুঝতে সহযোগিতা করে—কারা তাওহীদবাদী আর কারা ভাওতাবাজ! কারা মিল্লাতে ইবরাহীমের উপর অবিচল, আর কারা 'বালআম বিন বাউরা'র আদর্শে অনুপ্রাণিত!

না, তাওহীদের এ যুগান্তকারী দরস শেষ হয়নি..!

শায়েখ উসামা ও তাঁর সহযোদ্ধাগণ আমাদের বিস্ময়করভাবে শেখালেন– তাওহীদের মর্মবাণী কীভাবে বক্ষে ধারণ করতে হয়; তার রঙে জীবনকে রাঙাতে হয়!

বীর আহমদ হাযনভীর কথাই ধরুন না! তাঁকে তো ইমামই বলতে হয়। আল্লাহর পথে কীভাবে উৎসর্গ হতে হয় তা তিনি উম্মাহকে শেখালেন নিজে উৎসর্গীত হয়ে। কুরআনের বর্ণনার সাথে এঁদের কী চমৎকার মিল! আল্লাহ মুমিনদের অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছেন–

مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ . فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ . وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا

'মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সাথে কৃতওয়াদা পূর্ণ করেছে। তাদের কেউতো মৃত্যুবরণ করেছে আর কেউ প্রতীক্ষায় আছে। তারা তাদের সংকল্প মোটেই পরিবর্তন করেনি। [সুরা আহযাব:২৩]

আপনার অনুভূতি তখন কেমন হল, যখন আপনি আহমদ হাযনভী রহ. কে শুনলেন ৯/১১ এর মাস কয়েক পূর্বে আবেগমথিত হৃদয়ে, নির্ভিক চিত্তে বলছেন— ' হে আল্লাহ! আপনি আমাদের রক্তের বিনিময়ে আমাদের ওপর সন্তুষ্ট হোন!'

এরপর দেখলেন, তিনি আল্লাহর রাহে নিজেকে উৎসর্গ করে দিলেন। কুফরের গর্বের প্রতীক আকাশছোঁয়া ভবনগুলো ধূলোর ঢিবিতে পরিণত করার লক্ষ্যে উড়ে চললেন সাথীদের নিয়ে।

এরচে' সততা ও তাওহীদ আর কী হতে পারে? আমরা তাদের ব্যাপারে এরূপ বিশ্বাসই রাখি; তবে আল্লাহই সর্বজ্ঞাত। হে আল্লাহ! আপনার মুজাহিদ বান্দারা নিজেদের সর্বস্ব বিলিয়ে যাচ্ছেন; শুধু আপনার সন্তুষ্টি অর্জন ও আপনার প্রতি, আপনার রাসূলের প্রতি অগাধ বিশ্বাস থেকেই।

হে আল্লাহ! আপনি তাদের প্রচেষ্টায় পূর্ণতা দিন, তাদের ওপর ধৈর্যের ছায়া বিস্তৃত করুন। তাদের ওপর স্বীয় করুণা বর্ষণ করুন। তাদের শত্রুদের ব্যর্থ করুন। ওদের ওপর আপনার অপ্রতিরোধ্য শাস্তি ও ক্রোধ বর্ষণ করুন।

হে আল্লাহ! আমৃত্যু তাদের নুসরত করুন। আপনার ও তাদের শত্রুদের ধ্বংস নিশ্চিত করে তাদের আত্মাকে সুশীতল করুন। আমীন।

আল্লাহর শপথ! আমেরিকা শান্তি-স্থিতির কল্পনাও করতে পারবে না,
যতক্ষণ না আমরা ফিলিস্তিনে শান্তিতে বসবাস করতে পারি।

SHEIKH USAMA BIN LADEN [R.]

নূহ আ. এর দাওয়াত ও আমাদের শিক্ষা

উস্তায আহমাদ নাবীল

আল্লাহ্ সুবহানাহু তায়ালার একজন নবী, নূহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম। যিনি ছিলেন একজন দায়ী। তিনিই সব চেয়ে দীর্ঘ সময় দ্বীনের পথে দাওয়াতের কাজ করেছেন। এক-দুই বছর নয়। একশত-দুইশত বছরও নয়। প্রায় হাজার বছর যিনি দ্বীনের দাওয়াতের কাজ করেছেন। দাওয়াত দিয়েছেন, গোপনে ও প্রকাশ্যে। দাওয়াত দিয়েছেন রাত্রে ও দিনে।

তিনি দাওয়াত দিয়েছেন আল্লাহ তায়ালার আদেশ পালনে। সাড়ে নয় শত বছর দাওয়াত দিয়ে তিনি কি অভিজ্ঞতা অর্জন করলেন? তিনি আল্লাহ তায়ালাকে বলেছেন, "হে আমার রব! পৃথিবীতে একটি কাফেরকেও বাঁচিয়ে রাখবেন না। যদি আপনি তাদেরকে ছেঁড়ে দেন তারা আপনার বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করবে। আর তাদের ঔরসজাত সন্তানগুলোও হবে কাফের-ফাজের।" -সূরা নূহ, আয়াত: ২৭

নূহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম দীর্ঘ সময় দাওয়াতের পর উপলব্ধি করেছেন, এই সমস্ত কাফেরগুলো দাওয়াতের পথে মূল বাঁধা। তারা নিজেরা তো ঈমান আনবেই না বরং আল্লাহ তায়ালার উত্তম বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করবে। তাই তিনি তাদের শাস্তি ও ধ্বংসের জন্য আল্লাহ তায়ালার কাছে দুয়া করেছেন।

আল্লাহ তায়ালা তার ডাকে সাড়া দিয়েছেন। এই অবাধ্য কাফের সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছেন। শেষ নবী মুহাম্মাদে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লামের উম্মতদের ক্ষেত্রেও আল্লাহ তায়লার এই নিয়ম বিদ্যমান আছে, "যে সমস্ত কাফেররা দাওয়াত গ্রহণ করবে না তাদেরকে তিনি পৃথিবীতেই শাস্তি প্রদান করবেন।"

তবে এই উম্মতের ক্ষেত্রে পার্থক্য দুটিঃ-

১. দাওয়াত দেওয়ার পর সাড়ে নয় শত বছর অপেক্ষা করতে হবে না। দাওয়াতের পরবর্তী মারহালাই হচ্ছে জিঝয়া অথবা কিতাল।

২. অন্যান্য নবীর দাওয়াতকে যারা অস্বীকার করেছে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে শাস্তি দিয়েছেন ফেরেশতাদের মাধ্যমে। আর মুহাম্মাদে আরবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত যারা গ্রহণ করবেন না তাদেরকে তিনি শাস্তি দেবেন তার অপর সৃষ্টি মানুষের মাধ্যমে, মুমিন বান্দাদের মাধ্যমে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, "তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের হাত দিয়ে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন।" -সূরা তাওবা, আয়াত: ১৪

লক্ষণীয়ঃ জিহাদ! কাফেরদের জন্যও রহমত

এই উম্মতের মধ্য থেকে যারা কাফের, জিহাদ তাদের জন্যও একটা অনেক বড় নিয়ামত ও রহমত। কারণ, অন্য উম্মত যখন নবীকে অস্বীকার করত আর জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করত, আল্লাহ তায়ালা পুরো জাতিকে সমূলে ধ্বংস করে দিতেন। শিশু হোক বা বৃদ্ধ, নারী কিংবা পুরুষ, দুর্বল কিংবা সবল, কেউ রেহাই পেতনা। আর ধ্বংসের পর, পরকালে তো রয়েছে চিরকালের জন্য জাহান্নাম।

কিন্তু জিহাদের ফলে, সকল কাফের সমূলে ধ্বংস হয়না। বরং তাদের নির্দিষ্ট একটা শ্রেণী নিহিত হয়। আর এর ফলেই অন্য সকলের জন্য সঠিক পথ খুলে যায়। জিঝিয়া দিয়ে ইসলামের ছায়াতলে সময় অতিবাহিত করতে পারে। তাদেরকে ইসলামের বাস্তব রূপ কাছ থেকে দেখার সুযোগ করে দেয়া হয়। পরবর্তী-তে দেখা যায়, তারা দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়। যার ফলে আল্লাহ তায়লার এই বান্দাগুলো ইহকাল-পরকাল উভয় জগতের শাস্তি থেকে মুক্তি পায়। জান্নাতে তাঁদের জন্য তৈরি প্রাসাদটায় চিরদিনের জন্য রাজত্ব করে।

হে দ্বীনের দায়ী! আপনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরীয়তের অনুসরণ করুন। কারণ এটাই হচ্ছে পুরনাঙ্গ শরীয়ত। আর আমরা, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মত।

ফরীদ উদ্দীন মাসউদ সাহেবের ভক্ত এক আলেমের সাথে কয়েক মুহূর্ত

উস্তায মুগীরা সামেত

তিনি **ফরীদ মাসউদ** সাহেবের একজন ছাত্র। কয়েকদিন তার কাছে পড়েছেনও। আমার সাথে সম্পর্কও ভালো। সম্পর্ক যাতে তিক্ত না হয় এজন্য উভয়ই সম্পর্কচ্ছেদন বাক্য থেকে বিরত থাকি।

একদিন হলো কি!

আমি অন্য একজন আলেমের সাথে শাতিমে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরুদ্ধে চালিত অপারেশন সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম, এমন সময় তিনি উপস্থিত, কোনো ধরনের রাখ-ঢাক ছাড়াই আমাদের কথা কেড়ে নিলেন। আর আমাকে বেকায়দায় ফেলার লক্ষ্যে উপর্যুপরি প্রশ্ন শুরু করলেন। আমি প্রথমে বিব্রতকর মুহূর্তে পড়লেও পরে খুব শীঘ্রই নিজেকে সামলে নেই। অনেক সময় আলোচনা হয়, শেষ পর্যন্ত তিনি নীরব হয়ে যান। সেখানে নিম্নোক্ত বিষয় নিয়ে কথোপকথন হয়। গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পয়েন্ট তুলে ধরলাম।

তিনি ঃ- নাস্তিক বা শাতিমদেরকে শাস্তি দেওয়ার দায়িত্ব সরকারের, তাহলে আল-কায়েদা কেনো আইন নিজ হাতে তুলে নিচ্ছে?

আমি ঃ- আল-কায়েদার এসব অপারেশন হুদুদ (ইসলামি দণ্ডবিধি) নয়, এগুলো হচ্ছে জিহাদ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কা'ব বিন আশরাফকে হত্যার জন্যে মুহাম্মদ বিন মাসলামা রাযি. ও তাঁর সাথীদেরকে পাঠিয়েছিলেন। পরে এঁরা কা'বকে হত্যা করেন। কা'ব কিন্তু রাসুলুল্লাহর শাসনাধীন এলাকায় ছিলো না। তাই তাকে হত্যা করার জন্যে বাহিনী পাঠাতে হয়েছে। পরে এই বাহিনী কোনো ধরনের বিচারিক পদ্ধতি ছাড়াই কা'বকে হত্যা করেন। যদি এটা হুদুদ হত তাহলে কেনো আল্লাহর রাসুল কা'বকে কাঠগড়ায় দাঁড় করান নি? ইতিহাসের পাতায় এই অভিযানের নাম দেওয়া হয়েছে সারিয়্যাতু মুহাম্মদ বিন মাসলামা রাযি.। তাছাড়া হাদীসের কিতাবে এটাকে কিতাবুল হুদুদে স্থান না দিয়ে কিতাবুল মাগাযীতে স্থান দেওয়া হয়েছে।

তিনি ঃ- যদি আল-কায়েদার এই অপারেশন জিহাদ হয়ে থাকে তাহলে জিহাদ ফরজ হওয়ার জন্যে শর্ত হচ্ছে মুসলিম সুলতান আমীরুল মুমিনীন কর্তৃক ঘোষণা হওয়া, তথা নফীরে আম হওয়া। এখানে কোন আমীরুল মুমিনীন এদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে নির্দেশ দিয়েছেন?

আমি ঃ- জিহাদ ফরজ হওয়ার জন্যে কি শুধু নফীর আমই শর্ত? জিহাদ ফরজ হওয়ার জন্যে তো আরো শর্ত আছে। যেমন- মুসলিম ভূমি কাফেরদের দখলে চলে যাওয়া, কোনো মুসলিম কাফিরের হাতে বন্দী হওয়া, মুসলিম ভূমির সীমান্তে কাফিরদের সৈন্য মোতায়েন করা। বর্তমানে এর সবগুলিতো বিদ্যমান।

যেমন- উপমহাদেশ মুসলিমদের ভূমি ছিলো, এখন কাফিররা দখল করে নিয়েছে। বিভিন্ন মুসলিসদেশ বর্তমানে কাফিরদের দখলে চলে গেছে, আমাদের নিকটবর্তী আরাকান, আসামে মুসলিমরা নির্যাতিত হচ্ছে। কাফিরদের হাতে অনেক মুসলিম বন্দি, যেমন গুয়েন্তানামো বে, কারাগার ইত্যাদি। জিহাদ ফরজ হওয়ার জন্যে এগুলিইতো যথেষ্ট।

এরপরও যদি আমীরুল মুমিনীনের ঘোষণা চান, তাহলে জেনে রাখুন, আল-কায়েদা ইমারাতে ইসলামিয়্যাহ আফগানিস্তানের অধীনে পরিচালিত একটি সংগঠন। আর আমীরুল মুমিনীন মোল্লা উমর অনেক পুর্বেই জিহাদ ঘোষণা করেছেন।

তিনি ঃ- মোল্লা উমর তো আফগানিস্তানের লোক। আর বাংলাদেশে ঘোষণার দায়িত্ব হচ্ছে এদেশের সরকারের। সরকার যদি ঘোষণা না দেয় তাহলে তো অন্য কারো ঘোষণা দেওয়া জায়েয হবে না।

আমি ঃ- সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ রহ. যখন জিহাদের ঘোষণা দেন। তখন দিল্লীতে মুঘল শাসন চলছিলো, আর মধ্যপ্রাচ্যসহ ইউরোপ-আফ্রিকার অনেক দেশে উসমানি খেলাফতের শাসন চলছিল।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, উসমানী খলীফা এবং দিল্লী সম্রাটের উপস্থিতিতেই তাদের অনুমতি ব্যতীত সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ কর্তৃক এই জিহাদকে কী বলবেন? আপনি ওইটাকে জায়েয বললে এটাকে কেনো না জায়েয বলেন? তা ছাড়া কুফরি সংবিধান দ্বারা পরিচালিত বাংলাদেশ সরকার কীভাবে ইসলামি হয়?

তিনি ঃ- আল-কায়েদার এসব অপারেশন দ্বারা অনেক নিরীহ মানুষ মারা যায়!

আমি ঃ- বাংলাদেশে আল-কায়েদা কর্তৃক দু/একজন নিরীহ নিরপরাধ মানুষ হত্যার প্রমাণ দেন?

তিনি ঃ- (প্রথমে লা-জবাব) একটু থেমে বলেন, পাকিস্তানের পেশোয়ারের আর্মি স্কুলে!

আমি ঃ- আর্মি স্কুলে আল-কায়েদা হামল করে নি, বরং আল-কায়েদা এই হামলার নিন্দা করেছে। আমি শুধু আল-কায়েদা তালেবানের হয়ে কথা বলবো। অন্যকোনো দলের হয়ে নয়।

তিনি ঃ- আফগানিস্তানে হামিদ কারজাঈ একজন মুসলিম শাসক। তালেবানদের অপারেশনে তো কালেমা পাঠকারী অনেক মুসলিম সৈন্য মারা যাচ্ছে। এটা তো জায়েয নয়।

আমি ঃ- ইংরেজদের অধীনে চাকুরীরত মুসলিম সৈন্যদের ব্যাপারে শায়খুল ইসলাম হোসাইন আহমদ মাদানী রহ. এর ফতোয়া হচ্ছে যে, এরা নিকৃষ্ট মুরতাদ। বর্তমানে আফগান সৈন্য হচ্ছে আমেরিকার অধীনে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত মুরতাদ।

তিনি ঃ- আল-কায়েদা অপারেশন করছে, তাহলে সরকার কেনো অন্যদের অহেতুক হয়রানি করছে?

আমি ঃ- এর জন্যে সরকার দায়ী। তারা কেনো একজনের জন্যে অন্যজনকে নির্যাতন করে?

তিনি ঃ- আল-কায়েদার কি উচিৎ নয়, এগুলো সম্পর্কে সচেতন করা?

আমি ঃ- জ্বি, আল-কায়েদা এসম্পর্কে বার বার নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করছে, তারপরও এই জালিমরা এরকম করে যাচ্ছে।

যাইহোক একপর্যায়ে তার ঝুলিতে যত অভিযোগ ছিলো, সব শেষ হয়ে যায়। একেবারে নিশ্চুপ হয়ে যান। আমার থেকে পালানোর পথ খুঁজতে থাকেন। আমি তার সাথে বার বার আলোচনার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখি। কিন্তু দেখি স্থান ত্যাগ করে চলে যান। আর পরবর্তী আর কোনোদিন এ বিষয়ে আলোচনায় জড়ান নি।

সর্বাঙ্গে ব্যথা ওষুধ দিবো কোথায়?

আবু আব্দুল্লাহ

বর্তমান মুসলিমবিশ্বের পরিস্থিতি যদি এক বাক্যে প্রকাশ করার কথা বলা হয়, তাহলে মুখ ফসকে যে বাক্যটি বেরিয়ে আসবে তা হচ্ছে- সর্বাঙ্গে ব্যথা ওষুধ দিবো কোথায়?

এই কথার সাথে আপনার দ্বি-মত করার অবকাশ আছে। যদি শেষপর্যন্ত সঙ্গে থাকেন তাহলে আশা করি দ্বিমত অনেকাংশ কমে আসবে।

আসুন, তাহলে এবার আলোচনাটা সামনে এগিয়ে নিই। আমরা যদি মুসলিমউম্মাহর বর্তমান শত্রুর গতিবিধির ওপর নজর বুলাই তাহলে দেখতে পাই, ইসলামের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত আমাদের যতসব শত্রু আছে, সবাই ভিন্ন ভিন্ন অজুহাতে এই মজলুম উম্মাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে।

আমাদের এক শত্রু ইয়াহুদী। তারা আমাদের প্রথম কিবলা কেড়ে নিয়েছে, অতঃপর সেখানে আমাদের প্রবেশও বন্ধ করে দিয়েছে।

আমাদের আরেক শত্রু হচ্ছে খ্রিষ্টান। তারা ভিন্ন ভিন্ন ফ্রন্টে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত। আফগানিস্তান, ইয়েমেন, সিরিয়া, ইরাক, ওয়াজিরিস্তান, মালি, সোমালিয়া, সুদান, মধ্য-আফ্রিকা এবং বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে তারা প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে নানা ছদ্মাবরণে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে।

আমাদের আরেক শত্রু হচ্ছে মুশরিক। এরা কখনো হিন্দুর অবয়বে, আবার কখনো বৌদ্ধের অবয়বে চীন, ভারত, মিয়ানমার, শ্রীলংকায় আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের আরেক শত্রু হচ্ছে মুনাফিক তথা যিন্দীক। এই শত্রুরা কখনো শীয়াদের আকৃতিতে, আবার কখনো নুসাইরীর আকৃতিতে ইরাক, সিরিয়া, ইয়েমেন, লেবানন ও বাহরাইনে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে।

কুরআন শরীফে উপরোক্ত চার শত্রুকে ইসলাম ও মুসলমানদের প্রধান শত্রু চিহ্নিত করা হয়েছে। তাই এভাবে বিন্যাস করলাম। আর আজ এরা সবাই একাট্টা হয়ে আমাদের নির্মূল করতে নেমেছে। এদিকে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা ও পরিচর্যা করছে শত্রুকুল গডফাদার জাতিসংঘ। অতীতে কোনোদিন সব শত্রু আমাদের বিরুদ্ধে একসাথে এভাবে একাট্টা হয় নি।

এতো গেলো আমাদের শত্রুর গতিবিধি। এবার নামধারী মুসলিম শাসকদের উপর চোখ বুলান। তাহলে দেখবেন যে, শত্রুকুল গডফাদার জাতিসংঘ, আমেরিকা ও ইইউয়ের সামনে তাদের জুতা সাফ করা ও হাত কচলিয়ে দাঁড়ানো ছাড়া আর কোনো অবদান নেই। যে জায়গায় গেলে ওই শত্রুরা নিজেদের জুতো কর্দমাক্ত হওয়ার আশঙ্কা করে সেখানে তারা এদেরকে ব্যবহার করে। সৌদী, পাকিস্তান ও তুরস্কের এ ক্ষেত্রে একই অবস্থা।

এতো গেলো বহির্বিশ্বের অবস্থা। এবার শুনুন, স্বদেশের কথা।

প্রথমেই আমরা বাংলাদেশের ইসলামি রাজনীতির উপর একটু চোখ বুলাই। এক্ষেত্রে শেখ হাসিনার কথাই প্রথমে আমাদের স্মরণ হবে, মানে- বাংলাদেশে ইসলামি রাজনীতির জিরো টলারেন্স চলছে! অনেকে এ কথার ওপর তীব্র আপত্তি তুলে বলবেন, আপনার চোখে কি বাংলাদেশের ইসলামি দলগুলোর আন্দোলন-ফান্দোলন নজরে পড়ে না?

আমি বলবো, হ্যাঁ, নজরে পড়ে! কিন্তু আমি জানতে চাচ্ছি, ইসলামি রাজনীতির প্রধান উদ্দেশ্য কী? আন্দোলন-ফান্দোলন? না, শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা? দেখানতো, এতো বছর রাজনীতি করার পর অন্তত অন্তত একটি এলাকায় এক সেকেন্ডের জন্যে শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা করার খবর! যদি হালির পর হালি ইসলামি দল বৃদ্ধির নাম ইসলামি রাজনীতির সফলতা হয়ে থাকে, তাহলে কেনো এদেশে পাপাচারের হার বাড়ছে? কেনো শাহবাগে বদমাশদের প্রকাশ্য র‍্যালি হচ্ছে? এটা কি ইসলামি রাজনীতির ব্যর্থতা নয়?

আপনি একদিকে রুমের মধ্যে এসি চালু করলেন, অন্যদিকে দরোজা-জানালা খুলে দিলেন, তাহলে কি এ এসির কোনো অর্থ আছে? বস্তার পর বস্তা ওষুধ খেলেন, কিন্তু রোগ মোটেও কমলো না; তাহলে কি এ ওষুধের কোনো মূল্য থাকে?

এমনিভাবে হালির পর হালি ইসলামি দল গজিয়ে ওঠার পরও যদি এদেশে শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা না হয়, পাপাচার বেড়েই চলে, তবে কি এটা ইসলামি দলের সফলতা?

আপনি এবার এদেশের শিক্ষাব্যবস্থার দিকে চোখ বুলান, তাহলে দেখবেন, এটা কোনো মানুষ তৈরির সিলেবাস নয়, বরং এটা হচ্ছে পরিমল-পান্না তৈরির সিলেবাস, যার দ্বারা তৈরি হবে ঐশীর মতো মেয়ে; পরবর্তীতে এরাই কয়েকটা বয়ফ্রেন্ডের সাথে শয়নের জন্যে মা-বাপকে কুপিয়ে মারবে। এটা হচ্ছে মানুষকে পশু বানানোর সিলেবাস। যার প্রধান লক্ষ্য পেটতন্ত্র বাস্তবায়ন। সকাল-সন্ধ্যা কুকুরের মতো পেটের ধান্ধায় ছোটাই এর প্রধান উদ্দেশ্য। নিজের সৃষ্টিকর্তাকে চিনা এর লক্ষ্য কখনোই নয়!

-আবুল মালের কথা শুনলে এটা আরো দৃঢ় হয়।

এবার আসুন, আমাদের নিজেদের উপর চোখ বুলাই। তাতারীদের হাতে বাগদাদ পতনের সময় সেকালের আলেমদের যে অবস্থা ছিলো, কমিউনিস্টদের হাতে বোখারা-সমরকন্দের পতনের সময় তখনকার আলেমদের যে অবস্থা ছিলো, বর্তমানে এই উম্মাহর কঠিন দুর্দিনে আমাদের আলেমদের অবস্থা এরচেয়ে কম নয়। যেসব মাসআলা-মাসায়িলের সমাধান আমাদের পূর্বসুরী আলেমরা বছরের পর বছর দিনকে রাত করে, রাতকে দিনকে করে সূর্যের আলোর মতো পরিষ্কার সমাধান দিয়ে গেছেন, আজ সেসব মীমাংসিত বিষয় নিয়ে নতুনভাবে ফিতনা ছড়ানো হচ্ছে। ফোঁড়াকে চুলকাতে চুলকাতে টিউমার বানানো হচ্ছে। কথায় কথায় চলছে ফতোয়া।

আরেকদল আছেন, যারা টিভি স্ক্রীনের সামনে স্টুডিওতে এসির ভেতরে বসে শুধু 'শিরক' 'বেদাত' বলে মুখে ফেনা তুলছেন, অথচ তাদের বেদাত বুলি হচ্ছে সীমিত কয়েকটি বিষয়ের উপর, রাষ্ট্রকর্তৃক শতাধিক শিরক-বেদাত নিয়ে ওদের টু শব্দ নেই। আছেন শুধু কথিত শিরক-বেদাত নিয়ে নিজেদের ইলমের লালবাতি জ্বালাতে।

এবার বলুন, উম্মাহর বর্তমান অবস্থা নিয়ে আমার উপরোক্ত উক্তি উল্লেখ করা কি ভুল হয়েছে? আশাকরি এতক্ষণের সহযাত্রায় আমাদের মতের দূরত্ব অনেকটা কমে এসেছে।
বর্তমান মুসলিমদের অবস্থাকে যদি আপনি একটি বিল্ডিংয়ের সাথে তুলনা করেন, তাহলে জেনো রাখুন, এই বিল্ডিংয়ের পিলার, ইট, বালু, পাথর ও রঙসহ সবকিছুর ডেট ওভার হয়ে গেছে। যেকোনো সময় রানা প্লাজার কাহিনী ঘটতে পারে। এই যদি হয় বিল্ডিংয়ের অবস্থা, তাহলে কি আমাদের উচিৎ নয়, এটা ভেঙ্গে নতুন আরেকটি বিল্ডিং নির্মাণ করা?
আজ ইসলাম নামক বিল্ডিংয়ের ভেতর বস্তুবাদ, ভোগবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, শিরক ও বেদআত ইত্যাদি পিলার, ইট, পাথর, বালু, সিমেন্ট হিসেবে ঢুকে তা পতনোন্মুখ করে দিয়েছে। সুতরাং এটা তছনছ করে নতুন এক বিশ্বব্যবস্থা রচনা করতে হবে, যেভাবে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরবের জাহিলি ব্যবস্থা উচ্ছেদ করে ইসলাম নামক বৃক্ষের জন্ম দিয়েছেন। নতুবা কখনো পিলার, আবার কখনো ইট বদল করে বর্তমান পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ সম্ভব নয়। আর এই নতুনব্যবস্থা হচ্ছে আমাদের হারানো ধন, গৌরবের মুকুট 'খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নবুওয়াহ'।

যে খলীফা নির্বাচিত হবেন উম্মাহের দীনদার প্রভাবশালী ব্যক্তি ও আলেমদের মতামতের দ্বারা। যে খলীফার প্রধান লক্ষ্য হবে উম্মাহকে এক করা, বিভক্ত করা নয়। যিনি শুধু শুধু বায়য়াত তলব না করে উম্মাহর সংরক্ষণের দিকে মনোযোগী হবেন। যাকে এই উম্মাহ স্বাগত জানাবে, যার ভয়ে পালিয়ে যাবে না, সমুদ্রে ডুবে মরবে না। যিনি হযরত আবু বকর রাজিয়াল্লাহু আনহুর মতো একই সাথে কয়েক ফ্রন্টে সৈন্য পরিচালনা করবেন, হযরত উমর রাজিয়াল্লাহু আনহুর মতো ফেকহী ইখতেলাফকে রাষ্ট্রীয়ভাবে সমাধান দিবেন। যিনি হযরত হাসান রাজিয়াল্লাহু আনহুর মতো প্রয়োজনে ক্ষমতা থেকে সরেও উম্মাহর আভ্যন্তরীণ রক্তপাত বন্ধে সচেষ্ট হবেন। যার ভয়ে ইউরোপ-আমেরিকা আমাদের উপর ছড়ি ঘুরানোর পরিবর্তে ট্যাক্স দিবে।
জানি এগুলো স্বপ্ন, কিন্তু এর বাস্তবায়ন অসম্ভব নয়।
যদি এমন শাসকের ছায়ায় অন্তত একদিন বসবাস করতে পারতাম!!

নিশ্চয়ই মুসলিম রাষ্ট্রের কল্যাণের উপরে উম্মাহর কল্যাণ প্রাধান্য পাবে, আর নিশ্চয়ই জামা'আর কল্যাণের উপরে মুসলিম রাষ্ট্রের কল্যাণ প্রাধান্য পাবে, আর নিশ্চয়ই ব্যক্তির কল্যাণের উপরে জামা'আর কল্যাণ প্রাধান্য পাবে।

ইমামুল মুজাহিদীন
শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ.

শামের জিহাদের বাস্তবতা, জাবহাতুন নুসরার স্বাধীনভাবে পথচলা, উম্মাহর কল্যাণে আল-কায়েদার নীতি ও কৌশল

আব্দুল্লাহ হাসান

নিম্নোক্ত ৫ টি পয়েন্টে লেখাটিকে সাজানোর চেষ্টা করেছি। যথাঃ-

১। স্বতন্ত্র ইমারার অধীনে জাবহাতুন নুসরার পথচলার প্রেক্ষাপট ও কারণ

২। আল-কায়েদার নীতি ও জাবহাতুন নুসরার স্বতন্ত্র ইমারাহ

৩। ভিডিও বার্তায় শাইখ জুলানী হাফি. এর ৫ দফা কর্মসূচী

৪। নতুন এই পথচলায় আল-কায়েদার প্রভাব

৫। নতুন এই কৌশলের সম্ভাব্য ফলাফল

১। স্বতন্ত্র ইমারার অধীনে জাবহাতুন নুসরার পথচলার প্রেক্ষাপট ও কারণঃ

শামের বরকতময় জিহাদ সম্পর্কে যারা অবগত, তারা নিশ্চয়ই শামে আল-কায়েদার শাখা হিসেবে জাবহাতুন নুসরার বরকতময় জিহাদ সম্পর্কেও অবগত থাকার কথা।

নুসাইরী কুফফার বাশার আল-আসাদের বিরুদ্ধে শামের মুসলিমদেরকে সুরক্ষা দেওয়া এবং শামের বরকতময় ভূমিতে আল্লাহর শরীয়াহ কায়েমের সুমহান লক্ষ্যে আল-কায়েদার সম্মানিত আমীর হাকীমুল উম্মত শাইখ আইমান আয-জাওয়াহিরী হাফি. এর নির্দেশে আল-কায়েদার কিছু মুজাহিদকে ইরাক থেকে শামে জিহাদের জন্য প্রেরণ করা হয়।

ইসলামের আন্তর্জাতিক দুশমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার কুফর মিত্রদের চক্রান্ত থেকে শামের মুসলিমদেরকে রক্ষা করার জন্য জাবহাতুন নুসরাহ যে আল-কায়েদার শাখা তা গোপন রাখার নির্দেশ প্রদান করা হয়। হাকীমুল উম্মতের নির্দেশনার আলোকে শাইখ আবু মুহাম্মাদ ফাতিহ আল-জাওলানী হাফি. এর নেতৃত্বে নুসাইরী কুফফার আসাদের বিরুদ্ধে তুমুল লড়াই করতে থাকে জাবহাতুন নুসরাহ। শামের মুসলিম জনতার মুক্তি ও আল্লাহর জমীনে আল্লাহর দ্বীন কায়েমে জাবহাতুন নুসরার অসাধারণ সফলতা ও অসম্ভব জনপ্রিয়তা গোটা শামকে আলোড়িত করে।

এমনি এক মুহূর্তে আল-কায়েদার ইরাক শাখা ইসলামিক স্টেইট ইন ইরাক আল-কায়েদার কেন্দ্রীয় কমান্ডকে পাশ কাটিয়ে জাবহাতুন নুসরাহকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করে ইসলামিক স্টেইট ইন ইরাক এন্ড শাম (ISIS) এর ঘোষণা দেয়। অতঃপর তৎকালীন ISIS এর এই মনগড়া ঘোষণার ফলে জাবহাতুন নুসরাহ প্রকাশ করতে বাধ্য হয় যে, তারা শামে আল-কায়েদার শাখা।

পরবর্তীতে শাইখ আইমান আয-জাওয়াহিরী হাফি. এটি প্রকাশ করার জন্য শাইখ জুলানী হাফি. কে তিরস্কারও করেন। শাইখ আইমান আয-জাওয়াহিরী হাফি. একটি বক্তব্যে বলেছিলেন, শামে আল-কায়েদার উপস্থিতি প্রকাশিত হয়ে যাওয়ায় বিশ্ব-কুফফার আমেরিকা শামের মুসলিমদের উপর আল-কায়েদার অজুহাতে আগ্রাসন চালাতে পারে। এতে শামের জনগণ বলবে, এমনিতেই আমরা আসাদের নির্যাতনে পিষ্ট। তদুপরি আল-কায়েদার কারণে আমেরিকা আমাদের উপর আরো আগ্রাসন চালানোর সুযোগ পেলো।

প্রায় আড়াই বছর আগে দেওয়া শাইখ আইমান আয-জাওয়াহিরী হাফি. এই বক্তব্য আজ অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হল।আজ মার্কিন শ্বেত ভল্লুকদের সাথে রুশ ভেড়ার পালও শামের মুসলিমদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করে চলছে।

উসিলা একটি, আর তা হচ্ছে এখানে আল-কায়েদা রয়েছে।

অতঃপর শামের জিহাদকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া সর্বগ্রাসী ফিতনা গোটা দুনিয়ার জিহাদের ময়দানগুলোকে গ্রাস করতে থাকে। যার ধারাবাহিকতায় আমরা আজ ওঝাওঝ এর এই লজ্জাজনক অধঃপতন দেখতে পাচ্ছি যে, যারাই তাদের সাথে দ্বিমত পোষণ করছে, তাদেরকেই তারা তাকফীর করছে অর্থাৎ মুরতাদ বলে আখ্যা দিচ্ছে। এমনকি গ্লোবাল জিহাদের যেই সম্মানিত শাইখ যাকে এই দাওলার মুখপাত্র নিজে 'হাকীমুল উম্মাহ' বলে আখ্যায়িত করেছিলো, সেই শাইখ আইমান আয-জাওয়াহিরী হাফি. কে পর্যন্ত এরা তাকফির করেছে এবং হত্যার ঘোষনা দিয়েছে !

শামের জিহাদকে কেন্দ্র করে মার্কিন-রুশ-ইরানী চক্রান্ত আজ এক চরম বাস্তবতা। গোটা বিশ্ব-কুফফার আজ শামের মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ। শামে যাতে আল্লাহর দ্বীন কায়েম না হয়, সেজন্য আল-কায়েদার শাখা জাবহাতুন নুসরাহকে নির্মূল করতে ইতোমধ্যে মার্কিন-রুশ ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এমতাবস্থায় কুফফার চক্রান্ত রুখতে, শামে আল্লাহর দ্বীন কায়েম করতে এবং মুসলিমদের সুরক্ষা দিতে হাকীমুল উম্মাহ শাইখ আইমান আয-জাওয়াহিরী হাফি.

এর নির্দেশনার আলোকে নতুন আঙ্গিকে স্বাধীনভাবে স্বতন্ত্র ইমারার অধীনে 'জাবহাতু ফাতহিশ-শাম' নামে জাবহাতুন নুসরার পথচলা শুরু হয়েছে।

২। আল-কায়েদার নীতি ও জাবহাতুন নুসরার স্বতন্ত্র ইমারাহ(নেতৃত্ব)

আল-কায়েদার নীতির ব্যাপারে শাইখ জুলানী হাফি. উনার ভিডিও বার্তায় শাইখ উসামা বিন লাদেন রাহি. এর একটি কালজয়ী উক্তি উপস্থাপন করেন। আর তা হচ্ছে, "বি-আন্না মাছলাহাতাল উম্মাহ মুক্বাদ্দামাতুন 'আলা মাছলাহাতিদ-দাও-লাতিল মুসলিমাহ, ওয়া আন্না মাছলাহাতাদ দাওলাহ মুক্বাদ্দামাতুন 'আলা মাছলাহাতিল জামা'আহ, ওয়া আন্না মাছলাহাতিল জামা'আহ মুক্বাদ্দামাতুন 'আলা মাছালিহিল আশখাছ "

অর্থাৎ নিশ্চয়ই মুসলিম রাষ্ট্রের কল্যাণের উপরে উম্মাহর কল্যাণ প্রাধান্য পাবে, আর নিশ্চয়ই জামা'আর কল্যাণের উপরে মুসলিম রাষ্ট্রের কল্যাণ প্রাধান্য পাবে, আর নিশ্চয়ই ব্যক্তির কল্যাণের উপরে জামা'আর কল্যাণ প্রাধান্য পাবে। (১ মিনিট ১৬ সেকেন্ড থেকে)

শাইখ উসামা রাহি. এর উপরোক্ত কালজয়ী বক্তব্যের আলোকেই শামে জাবহাতুন নুসরার এই নতুন আঙ্গিকে পথচলা। এছাড়া ইতোপূর্বে শাইখ আইমান আয-জাওয়াহিরী হাফি. শামের জিহাদ নিয়ে বলতে গিয়ে কয়েকবার বলেছেন, আল-কায়েদা শামের জনগণকে শাসন করার জন্য জিহাদ করছে না বরং শামের জনগণ যাতে আল্লাহর শারীয়ার অধীনে জীবন অতিবাহিত করতে পারে, সেজন্য আল-কায়েদা লড়াই করছে।

সত্যিকার অর্থে আল-কায়েদা দুনিয়ার কোথাও নিজেদের মনগড়া শাসন কায়েম করার জন্য, কিংবা নিজেরা শাসক হওয়ার জন্য লড়াই করছে না বরং আল্লাহর জমীনে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্যই লড়াই করছে।

গত 'মে' মাসের প্রথম দিকে 'ইনফিরু..লিশ-শাম' অর্থাৎ 'শামের (জিহাদের) জন্য বের হোন' শিরোনামে দেওয়া অডিও বার্তায় শাইখ আইমান আয-জাওয়াহিরী হাফি. একদম স্পষ্টভাবে বলেছেন, শামে একটি ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে যদি জাবহাতুন নুসরাহকে আল-কায়েদার অধীন থেকে বের হয়ে স্বতন্ত্র নেতৃত্বে চলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, তাহলে তাতে আল-কায়েদার কোনো আপত্তিতো থাকবেই না বরং আল-কায়েদা তাতে সর্বাত্মক সহায়তা করবে। এমনকি সম্ভব হলে স্বয়ং শাইখ আইমান আয-জাওয়াহিরী হাফি. উক্ত ইসলামী রাষ্ট্রের একজন অনুগত নাগরিক হওয়ার আকাংক্ষা পোষণ করেছেন। -উপরোক্ত বার্তার লিংক: http://tinyurl.com/he6g9qr

আর শাইখ আইমান আয-জাওয়াহিরী হাফি. এর উপরোক্ত নির্দেশনার আলোকেই কিছুদিন পূর্বে একটি ভিডিও বার্তার মাধ্যমে জাবহাতুন নুসরাহ 'জাবহাতু ফাতহিশ-শাম' নামে নিজস্ব ইমারার অধীনে পথচলার ঘোষণা দেয়।

৩। ভিডিও বার্তায় শাইখ জুলানী হাফি. এর ৫ দফা কর্মসূচীর ঘোষণা

ইমামুল মুজাহিদীন শহীদ শাইখ উসামা বিন লাদেন রাহি. ও শাইখ আইমান আয-জাওয়াহিরী হাফি. এর বক্তব্য উল্লেখ পূর্বক জাবহাতুন নুসরার আমীর শাইখ আবু মুহাম্মাদ ফাতিহ আল-জুলানী হাফি. পাঁচদফা কর্মসূচীসহ নতুন ভাবে পথচলার ঘোষণা দেন। উক্ত পাঁচ দফা কর্মসূচী হচ্ছে....

ক। আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা। আল্লাহর শরীয়াহকে বাস্তবায়ন করা এবং সব মানুষের মাঝে ন্যায়বিচার কায়েম করা।

খ। ত্বাগুত (বাশার) এর কাছ থেকে সমস্ত ভূমি মুক্ত করার লক্ষ্যে শামের সব মুজাহিদদেরকে ঐক্যবদ্ধ করা।

গ। শামের জিহাদকে রক্ষা করা এবং বৈধ সকল উপায় ব্যবহারের মাধ্যমে তা চালু রাখা।

ঘ। শামের মুসলিমদের খেদমত করা। তাদের দৈনন্দিন কষ্ট লাঘবে সকল বৈধ উপায় অবলম্বন করা।

ঙ। সাধারণ জনগণের জন্য নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা এবং সম্মানজনক জীবন-যাপন নিশ্চিত করা। উপরোক্ত প্রতিটি কর্মসূচী মূলত আল-কায়েদার গ্লোবাল জিহাদেরই কর্মসূচী। সুতরাং জাবহাতুন নুসরাহ এখনো পর্যন্ত অর্থাৎ গতকালের ঘোষণার মাধ্যমে আল-কায়েদার গ্লোবাল কর্মসূচীর বাইরে এক কদমও যায়নি।

৪। নতুন এই পথচলায় আল-কায়েদার প্রভাব কতখানি ?

প্রথমতঃ এটি শাইখ আইমান আয-জাওয়াহিরী হাফি. প্রদত্ত পূর্বে দেওয়া বক্তব্যের প্রতিফলন, শাম নিয়ে উনার বার্তার লিংক উপরে দিয়েছি।

দ্বিতীয়তঃ শামের জিহাদ ও মুসলিমদের কল্যাণ বিবেচনা করে আল-কায়েদার সেন্ট্রাল কমান্ডই মূলত জাবহাতুন নুসরাহকে স্বাধীনভাবে চলার সুযোগ করে দিয়েছে। এই পরিকল্পনাটি যে পুরোটাই আল-কায়েদার কেন্দ্রীয় কমান্ডের তা সরাসরি শাইখ জুলানী হাফি. গতকালের দেওয়া বার্তায় উল্লেখ করেছেন।

তিনি ভিডিওতে বলেন, "আমি শামের জনগণ, শামের জিহাদ এবং শামের বরকতময় বিপ্লবে এই অবস্থান (স্বাধীনভাবে পথচলার সুযোগ) নেওয়ার জন্য 'আমভাবে আল-কায়েদার ভাইদেরকে, নেতৃত্বকে এবং বিশেষভাবে ডাঃ আইমান আয-জাওয়াহিরী হাফি. ও নায়েবে আমীর শাইখ আহমাদ হাসান আল-খাইর হাফি. এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। শামের জিহাদের যথাযথ কল্যাণ হাসিলে তাদের (অর্থাৎ আল-কায়েদার কেন্দ্রীয় কমান্ডের) এই অবস্থান ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ থাকবে।" -ভিডিও বার্তার লিংক https://www.youtube.com/watch?v=oos-sAtDYbrs

অর্থাৎ এই অবস্থান সরাসরি আল-কায়েদার কেন্দ্রীয় কমান্ড অর্থাৎ শাইখ আইমান আয-জাওয়াহিরী হাফি. এর অনুমতি ও নির্দেশন-াক্রমেই হয়েছে।

তৃতীয়ত ঃ জাবহাতুন নুসরার আমীরের দেয়া ভিডিও বার্তাটি প্রদানের পূর্বে আল-কায়েদার কেন্দ্রীয় কমান্ডের নায়িবে আমীর শাইখ আহমাদ হাসান আবুল খাইর হাফি. জাবহাতুন নুসরার নতুনভাবে পথ চলার ঘোষণা দেন এবং তাদের এই পথচলাকে স্বাগত জানিয়ে একটি অডিও বার্তা প্রদান করেন। -অডিও বার্তাটির লিংক (আরবী টেক্সট+ইংরেজি সারাংশসহ) http://tinyurl.com/hsuq9lg

সুতরাং কেউ যদি বলে জাবহাতুন নুসরাহ নিজের সিদ্ধান্তে আল-কায়েদা থেকে বের হয়ে গেছে, সে মিথ্যা ও জালিয়াতির পথ অবলম্বন করেছে। সে তার খায়েশ ও আক্রোশ মিটানোর জন্য এধরণের মিথ্যা ও প্রোপাগান্ডার নিকৃষ্ট পথ অবলম্বন করেছে। সত্য সামনে আসার পরও যে খাহেশাতের অনুসরণ করবে, তার ব্যাপারে কী আর বলার আছে !

চতুর্থত ঃ আল-কায়েদার কেন্দ্রীয় কমান্ড কৌশলে আল-কায়েদার অনেক সিনিয়র শাইখগণকে শামের জিহাদ পর্যবেক্ষণের জন্য সরাসরি প্রেরণ করেছেন।

মূলতঃ তারাই এখন শামের জিহাদ পরিচালনা করছেন। উদাহরণস্বরুপঃ গ্লোবাল জিহাদের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি শাইখ আবু ফিরাস আস-সুরী রাহি. কে সরাসরি জাবহাতুন নুসরার কেন্দ্রীয় কমান্ডে দায়িত্ব প্রদান, শাইখ উসামা বিন লাদেন রাহি. এর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ শাইখ রিফাই আহমাদ ত্বহা রাহি. কে সিরিয়ার জিহাদ পরিচালনার জন্য প্রেরণ।

আরো বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, শাইখ জুলানী হাফি. এর ভিডিও বার্তায় উনার ডানপাশে সাদা পোষাক পরিহিত যে শাইখ বসে ছিলেন তিনি হচ্ছেন, শাইখ আইমান আয-জাওয়াহিরী হাফি. এর দীর্ঘদিনের সঙ্গী ও গ্লোবাল জিহাদের প্রবীণ ব্যক্তি শাইখ আহমাদ সালামা মাবরুক হাফি.। তিনি সেই আশির দশক থেকে শাইখ আইমান আয-জাওয়াহিরী হাফি. এর সঙ্গী হিসেবে জিহাদে যুক্ত রয়েছেন। তিনি বর্তমানে জাবহাতুন নুসরার কেন্দ্রীয় দায়িত্বে রয়েছেন।

আরেকটি কৌশলের বিষইয়ে না বললেই নয়, আল-কায়েদার কেন্দ্রীয় কমান্ডের নায়িবে আমীর শাইখ আহমাদ হাসান আবুল খাইর হাফি. বর্তমানে শামে আছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। জাবহাতুন নুসরার নতুনভাবে পথচলার ঘোষণা সম্বলিত শাইখ আহমাদ হাসান আবুল খাইর হাফি. এর অডিওটি আল-কায়েদার অফিসিয়াল শাখা আস-সাহাব থেকে না দিয়ে জাবহাতুন নুসরার অফিসিয়াল মিডিয়া 'মানারাহ আল-বাইদ্বাহ' থেকে প্রকাশ হওয়ায় ধারণাটি আরো মজবুত হয়েছে। আর শাইখ জুলানী হাফি. উনার ভিডিও বার্তায় এমন কোনো কথা বলেননি যে, আমরা আল-কায়েদার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলাম। বরং তিনি বলেছেন,

"ইলমান আন্না হাজাত-তাশকীলাল জাদীদ লাইসা লাহু 'আলাক্বাতুন বিআইয়্যি জিহাতিন খারিজিয়্যাহ"

অর্থাৎ জানানো যাচ্ছে যে, বাহিরের কোনো সংস্থা/প্লাটফর্মের সাথে এই নতুন সংগঠনের সম্পর্ক নেই।" (ভিডিও বার্তাটির ২ মিনিট ৪৩ সেকেন্ডে)

আল-কায়েদার কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যদি শামেই থাকেন, তাহলে বাহিরের কারো সাথে সম্পর্ক রাখার দরকার কী ! শামের ভেতরেইতো আল-কায়েদা রয়েছে ! (আল্লাহু আকবার !) কী অসাধারণ শব্দচয়ন !

উপরোক্ত প্রমাণাদির মাধ্যমে এটি দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, জাবহাতুন নুসরার এই অবস্থান সরাসরি আল-কায়েদার তত্ত্বাবধানেই হচ্ছে। আল-কায়েদার নেতৃত্বের বাইরে শরীয়াহ বহির্ভূত কোনো কিছু করলে কিংবা ভ্রষ্টতার নীতি অবলম্বন করলে আল-কায়েদার কেন্দ্রীয় কমান্ড অবশ্যই সে ব্যাপারে উম্মাহকে সতর্ক করবে এবং তাদের সাথে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করবে, যেমনটি ISIS এর ক্ষেত্রে আল-কায়েদা করেছে।

আলহামদুলিল্লাহ্, আল-কায়েদা দলের চেয়ে মুসলিম উম্মাহকে প্রাধান্য দেয়। আর তার চেয়ে অধিক প্রাধান্য দেয় শরীয়াহকে। ISIS এর মতো একটি বৃহৎ শাখার ক্ষেত্রেও আল-কায়েদার এই নীতির কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি। সুতরাং জাবহাতুন নুসরার ক্ষেত্রেও এই নীতির কোনো ব্যত্যয় ঘটবে না ইনশাআল্লাহ্।

৫। নতুন এই কৌশলের সম্ভাব্য ফলাফলঃ

এই কৌশলের মাধ্যমে অনেকগুলো কল্যাণ হাসিলের আশা করা যায় ইনশাআল্লাহ্। যেমনঃ-

ক। মার্কিন-রাশিয়া এখন প্রকাশ্যে আল-কায়েদার শাখা হিসেবে বিমান হামলার উসিলা হারাবে। কুফফার চক্র এখন আর মানুষকে বুঝাতে সক্ষম হবে না যে, আল-কায়েদার শাখা হওয়ার কারণে আক্রমণ করা হচ্ছে। সুতরাং কুফফার চক্র এখন হামলা করলে জনগন বুঝবে আল-কায়েদার শাখা হওয়ার জন্য নয় বরং ইসলামের জন্য মার্কিন-রুশ চক্র এই সর্বাত্মক হামলা চালাচ্ছে। ফলে এখন যত হামলা হবে, তত মুজাহিদ বাড়বে ইনশাআল্লাহ।

খ। শামের জনগণের সাথে ব্যাপকভাবে মিশে যাওয়া সম্ভব হবে। এতোদিন শামের বিভিন্ন দল, গোষ্ঠী, মিডিয়া আল-কায়েদার বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা করার কারণে অনেকে জাবহাতুন নুসরাহকে আল-কায়েদার শাখা হিসেবে বিবেচনা করে দূরে থাকতো। এখন আর তা হবে না ইনশাআল্লাহ।

গ। নতুন এই অবস্থানের মাধ্যমে শামে কারা আল্লাহর শরীয়াহ বাস্তবায়ন করতে চায়, তা একদম স্পষ্ট হবে। এতদিন আল-কায়েদার শাখা থেকে দূরে থাকার নাম করে অনেকে বিভিন্ন বাহানা দেখাতো। এখন সেসব পথ বন্ধ। আশা করি এর মাধ্যমে ঈমান ও নিফাক্ব আলাদা হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

ঘ। জাবহাতুন নুসরার আমীর স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, আমরা আল্লাহর জমীনে আল্লাহর শরীয়াহ বাস্তবায়নের জন্যই এই নতুন পদক্ষেপ নিয়েছি। সুতরাং এবার কারা শরীয়াহ বাস্তবায়নে অগ্রসর হয়, আর কারা আমেরিকার দালালী করে, তা আরো অধিক স্পষ্ট হবে। যেসব দল আল্লাহর জমীনে আল্লাহর শরীয়াহ বাস্তবায়ন করতে চায়না কিন্তু মুখে দাবী করে, তাদের দল থেকে সত্যপন্থী মুজাহিদগণ ব্যাপক আকারে জাবহাতুন নুসরাহ তথা 'জাবহাতু ফাতহিশ-শাম' এ যুক্ত হবে ইনশাআল্লাহ্।

পরিশেষে আল্লাহ তা'আলার উপর তাওয়াক্কুল করে বলবো, যেই রব্বে কায়েনাত শামের জিহাদকে ব্যাপকভাবে প্রসারিত করেছেন, সেই সুমহান রব শামে শরীয়াহকে বাস্তবায়নের কুদরতী ব্যবস্থা করে দিবেন, এটাই দৃঢ় বিশ্বাস। সকল চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে বরকতময় শামের মুবারক জিহাদ তার কাঙ্খিত গন্তব্যে পৌছবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ রব্বুল ইয্যত 'জাবহাতু ফাতহিশ-শাম' কে সেই বরকতময় গন্তব্যে পৌছার পথে কাণ্ডারির ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার তাউফীক্ব দান করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল 'আরশিল আযীম।
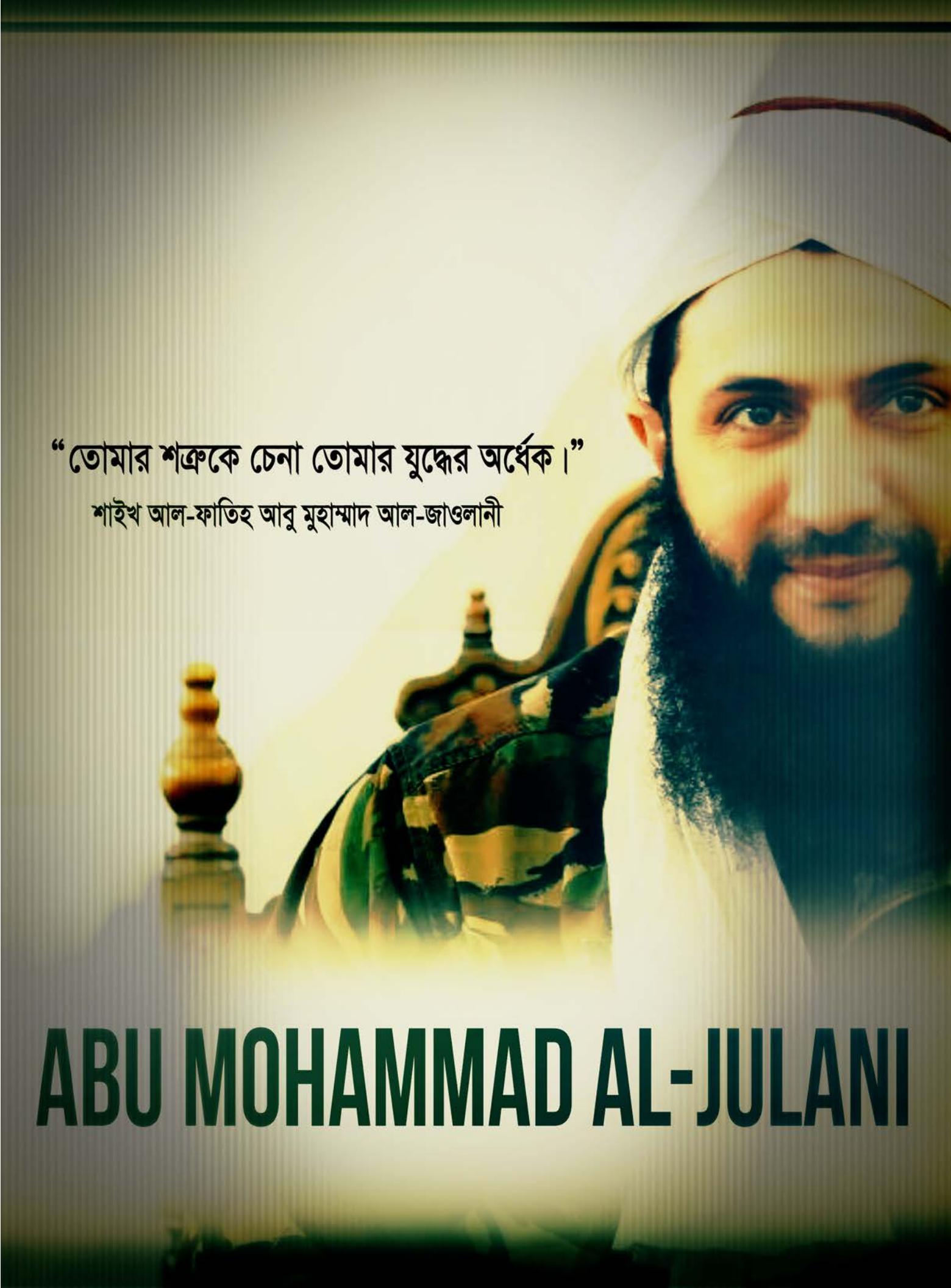
ABU MOHAMMAD AL-JULANI

এক হাতে কলম অপর হাতে তরবারি

আজকাল একটি বিষয় নিয়ে খুব জোরালো আলোচনা দেখা যাচ্ছে। সোস্যাল মিডিয়া, প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেকট্রনিক মিডিয়া সবাই এ আলোচনায় ব্যস্ত যে, আমাদেরকে নতুন প্রজন্মের হাত থেকে অস্ত্র সরিয়ে তাদের হাতে কলম তুলে দিতে হবে। একজন পাকিস্তানী নাগরিক হিসেবে বিষয়টি আমাকে খুবই অবাক করছে। আরো অনেক পাকিস্তানী এমন আছে যারা পাকিস্তানকে মনে প্রাণে ভালবাসে এবং প্রকৃতপক্ষে যারা মুসলিম, এবিষয়গুলো তাদের মনেও নাড়া দিয়ে থাকে।

এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট করে নিই, আমারা কলমের বিরোধী নই। কিন্তু একজন মুসলমান তার এক হাতে যদি থাকে কলম তাহলে অপর হাতে তরবারী থাকাই স্বাভাবিক। কেননা অস্ত্র এটা মহানবী সা. এর গরত্বপূর্ণ একটি সুন্নত। তাই মুসলিম হিসেবে অস্ত্রের প্রতি আমাদের ঘৃণা নয় ভালবাসা থাকা চাই। প্রিয় নবী সা. বলে গেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা একটি তীরের বিনিময়ে তিনজনকে জান্নাত দান করবেন । ১. প্রস্তুতকারী যে ভাল কাজের (জিহাদের) নিয়ত করবে। ২. শত্রুর দিকে নিক্ষেপকারী। ৩. ঐ ব্যক্তি যে তূনীর থেকে তীরন্দাজের হাতে তীর তুলে দিবে। আর এও বলে গেছেন যে, যে ব্যক্তি তীর চালানো শিখে অবহেলা করে ছেড়ে দিল সে যেন একটি নেয়ামত হাতছাড়া করল বা নেয়ামতের অকৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করল।

আজ যারা জোরালোভাবে অস্ত্রের বিরোধিতা করে যাচ্ছে তারা আমেরিকা, ইসরাইল এবং ভারতকে কি কখনো বলেছে ? তোমরা যে এত বিপুল পরিমাণে বিধ্বংসী অস্ত্র মজুদ রেখেছ এগুলো নষ্ট করে ফেল- যাতে- পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। অথচ ঐ রাষ্ট্রগুলো তাদের অস্ত্র মুসলমানদের বিরুদ্ধেও ব্যবহার করছে।

কিন্তু এসব সংগঠন এবং মিডিয়াগুলো- যারা অস্ত্রের বিরুদ্ধে প্রচারযুদ্ধে লিপ্ত কাফেরদের এজেন্টদের কখনো এ কথা বলেনি এবং বলবেও না। কেননা তাদের জন্যই হয়েছে মুসলমানদের বিরোধিতা করার জন্য। তাদের উদ্দেশ্যই হল কিভাবে মুসলমানদেরকে কাফেরদের জন্য তরল লোকমা হিসেবে পেশ করা যায়। যেমনিভাবে ফিলিস্তিনের মুসলমানদেরকে ইসরাইলের সামনে নিরস্ত্র ছেড়ে রাখা হয়েছে। যেন ইসরাইল যখন চাবে ফিলিস্তিনে এসে নিজেদের হিংস্রতার প্রকাশ ঘটাতে পারে। অন্যথায় কেন এই সংগঠন-গুলো ইসরাইলে গিয়ে অস্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেনা। অথচ এই অস্ত্রের মাধ্যমেই এক ইসরাইলির বদলায় দুই হাজার ফিলিস্তিনীকে শহীদ করা হয়।

অতএব আমাদের উচিত ঐ কাফেরদের কথায় কান না দিয়ে প্রিয় নবী সা. এর জীবনী অধ্যয়ন করা। তাহলে আমরা বুঝতে পারব অস্ত্রের প্রতি তাঁর কতইনা ভালবাসা ছিল। নিম্নের ঘটনা থেকে কিছুটা অনুমান করুন।

'নবী কারীম সা. এর তিরোধানের সময় তাঁর ঘরের অবস্থা ছিল এমন যে, চেরাগ জ্বালানোর মত তেলও মজুদ ছিল না, কিন্তু সে সময়ও হুজুর সা. এর ঘরে নয়টি তলোয়ার ঝুলন্ত ছিল।'

এর মাধ্যমে রাসূল সা. উম্মতকে এ শিক্ষা দিয়েছেন যে, তোমাদের উপর যেমন অবস্থাই আসুক না কেন, তোমরা এই তলোয়ার কে, এই অস্ত্র কে, এই জিহাদের পথকে, কখনো ছেড়ে দিওনা। আর এ কথাও স্মরণ রাখুন যে , রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক নাম তলোয়ার ওয়ালা নবী, অপর নাম যুদ্ধ প্রিয় নবী। প্রিয় নবী সা. বলে গেছেন, 'তরবারীর নিচে রাখা হয়েছে আমার ইজ্জতের রিযিক'। এটাও বলে গেছেন যে, 'জান্নাত তলোয়ারের ছায়া তলে'।

বাস্তবে এ সকল সংগঠন বড় একটি মিশন নিয়ে কাজ করছে। ইসলাম এবং কুফ্‌রের মধ্যকার বিশাল এক রণক্ষেত্র তৈরীতে তারা লিপ্ত। এটা ঐ ময়দান যেখানে ইয়াহুদীদের পক্ষ হয়ে মাঠে নামবে দাজ্জাল। আর মুসলমানদের পক্ষ হয়ে রণক্ষেত্র সজ্জিত করবেন 'মাহদী'। ঐ রণক্ষেত্র প্রস্তুত হওয়ার পূর্বেই এ সংগঠনগুলো চাচ্ছে মুসলমানদের নতুন প্রজন্মকে চিন্তাগত দিক থেকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে। যেন মুসলমানদের নতুন প্রজন্মের চিন্তা-চেতনা অন্ধকারেই থেকে যায়। তারা অস্ত্রকে ঘৃণা করতে থাকে। নিজেদের আসল নেতৃত্ব হারিয়ে ফেলে এবং নামমাত্র মুসলমান হয়ে কুফ্‌রের উপকারিতাকে পূর্ণতার শিখরে পৌছেঁ দেয়।

বাস্তবেই আজ আমরা মনের অজান্তে সে পথেই রওয়ানা হয়েছি। কাফেরদের এজেন্টরা যা বলে কোন বাছ বিচার ছাড়াই সে মোতাবেক কাজ করতে শুরু করে দেই। এ কথা চিন্তা করিনা যে, এর পিছনে তাদের মতলব কি! আপনারা ভুলে গেছেন কি বাগদাদের সেই ইতিহাস, যখন মুসলমানরা কলমের ময়দানে উচ্চতার শিখরে পৌছে গিয়েছিল, কিন্তু আফসোস তারা তলোয়ারকে একেবা-রেই ছেড়ে দিয়েছিল। যার দরুন বিশ্ববাসী দেখেছে, হালাকুখান এসে ঐ মুসলমানদেরকে কিভাবে কচু কাটার মত কেটেছিল। আর হ্যাঁ, কলম ও কিতাব রক্ষার জন্য তলোয়ার না থাকার কারণেই ফুরাত নদী কিতাবের স্তুপে পরিণত হয়েছিল।

আর জিহাদের ক্ষেত্রে নিরাপত্তাহীনতা নিয়ে যে প্রশ্ন ওঠে সে ক্ষেত্রে বলব, 'যদি এ জিহাদকে অনিরাপদ ও অশান্তিপূর্ণ রুপে ব্যক্ত করা হয় তাহলে পৃথিবীর বুকে শান্তি ও নিরাপত্তা কখনো প্রতিষ্ঠিত হবে না।' কেননা রাসূল সা. বলে গেছেন যে, এ জিহাদ ক্বিয়ামত পর্যন্ত চলবে। আল্লাহ তাআলা কি এ ফিতনার ব্যাপারে আমাদেরকে পূর্বেই সতর্ক করে দেননি ? কোরআনের এত স্পষ্ট আয়াত দেখেও আমরা কিভাবে কাফেরদের প্ররোচনার শিকার হই। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً

'শত্রুরা কামনা করে তোমরা তোমাদের অস্ত্র-শস্ত্র ও আসবাব-পত্র থেকে উদাসীন হয়ে থাক যাতে তারা তোমাদের উপর একযোগে হামলা করতে পারে'।

এসব কথিত শান্তিবাহক সংগঠনগুলোর জন্মই এ উদ্দেশ্যে হয়েছে, যেন তারা মুসলিম জাতির ভিতরে নড়বড়ে করে দিতে পারে। যেন কাফেররা রক্তপিপাসু হিংস্র প্রাণীর ন্যায় মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে এবং মুসলমানরা কাফেরদের লোকমায় পরিণত হয়।

এরপর যখন ভারত পাকিস্তানের উপর হামলা করে বসবে কারন কাফেররা মুসলমানদের অস্তিত্বই সহ্য করতে পারেনা। তখন আমরা বুঝতে পারব যে এ এজেন্টগুলো আমাদের কী ক্ষতি করে গেছে। কিন্তু তাতে কোন লাভ হবেনা। কেননা ততক্ষণে উঁইপোকা আমাদের ভিত সাবাড় করে ফেলবে।

আজ শান্তিপ্রিয়তার পাঠ দানকারীরা একথা বলে বেড়ায় যে, ইসলামের প্রচার-প্রসার হয়েছে তলোয়ারের জোরে নয়, আখলাকের জোড়ে। এখানে আমি সালাহ্উদ্দীন আইয়ূবী রহ. এর একটি কথা উদ্ধৃত করছি, তিনি বলেন, 'আমি জানিনা ইসলাম কি তলোয়ারের জোরে ছড়িয়েছে না আখলাকের জোড়ে; কিন্তু ইসলামের হেফাযতের জন্য তলোয়ারকে আমি আবশ্যকীয় মনে করি।'

একজন মুসলিম হিসেবে আমাদের একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, রাসূল সা. এর চেয়ে উত্তম চরিত্রের অধিকারী কেউ পৃথিবীতে কখনো আসেনি এবং আসবেওনা। সুতরাং যখন তিনি তাঁর উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে লোকদের সঠিক পথে আনতে পারেন নি এবং আল্লাহ তাআলা তাকে আদেশ করলেন তাদের বিরুদ্ধে তলোয়ার হাতে নেয়ার। ফলে সেই তলোয়ারের জোরেই মক্কা ও ইসলামের বিজয় হল। তাহলে এ লোকগুলো আজ কিভাবে একথা বলছে যে, এখন তলোয়ারের প্রয়োজন নেই। অথচ আল্লাহ তাআলা এই তলোয়ারের জয়কেই বাস্তবিক অর্থে জয় বলে আখ্যায়িত করেছেন। লক্ষ্য করুন সূরায়ে নাসরের দিকে, সেখানে কোন জয়ের কথা বলা হয়েছে যার পর মানুষ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে শুরু করেছে। সেটাওতো ছিল তলোয়ারের জয়।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. যাকাত আদায়ে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য এ বিষয়ের সমাধান দিয়ে গেছেন যে, ইসলামের রীতি নীতিতে কোন ধরনের সমস্যা সৃষ্টি ও কাঁট-ছাট করা কিছুতেই সহ্য করা হবেনা। কেননা ইসলামের নীতিতে কোন ধরনের পরিবর্তনের সুযোগ নেই। তাই ইসলামের প্রচারের ক্ষেত্রে যদি আমরা তলোয়ারের ভূমিকা বাদ দিয়ে দেই, তাহলে (নাউযুবিল্লাহ) দীনের স্বার্থে সাহাবাদের কুরবানীকে অনর্থক বলা হবে। কেননা তারা এই তলোয়ারকেই ব্যবহার করেছেন, এর মাধ্যমেই অধিকাংশ এলাকা জয় করেছেন এবং এর মাধ্যমেই মন্দকে প্রতিহত করেছেন। এর পর যখন বিজয়ী বেশে কোন দেশে প্রবেশ করেছেন তখন কাফেররা মুসলমানদের উত্তম গুনাবলী দেখে দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করেছে। এখানে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ঐ দায়ীই সফল হবে যার দাওয়াতের পেছনে থাকবে তলোয়ার। মুফতি শফী রহ. তাঁর তাফসীরগ্রন্থ মাআরেফুল কোরআনে এ আয়াত :

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ

এর ব্যাখ্যায় বলেন, মুহাম্মাদ সা. এর উম্মত সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত। একারণে যে তাদের দাওয়াতকে কেউ ঠেকাতে পারবেনা। কেননা তাদের দাওয়াতের পেছনে রয়েছে জিহাদের শক্তি। যে ব্যক্তি তাদের দাওয়াত কবুল না করবে তাকে জিহাদের মাধ্যমে দমন করা হবে। পূর্ববর্তী উম্মতের মাঝে দাওয়াত তো ছিল, কিন্তু তাদের দাওয়াতের পেছনে জিহাদের পাওয়ার ছিলনা।

হযরত ইদ্রীস কন্দলবী রহ. তার "সিরাতে মুস্তোফা" নামক গ্রন্থে বলেন, ভালোকথা ও সদুপদেশ অবশ্যই প্রভাব ফেলে, তবে তা সুস্থ বিবেকবানদের উপর। আর যাদের বিবেক নষ্ট হয়ে গেছে তাদেরকে আপনি যতই একনিষ্ঠতা ও সহানুভূতির সাথে সুন্দর থেকে সুন্দর উপদেশ দান করুননা কেন, তা তাদের উপর কোন প্রভাবই ফেলবেনা। কারণ মানব জাতির স্বভাব এক ধরনের নয়। এজন্যই আল্লাহ তাআলা কারো জন্য নাযিল করেছেন কিতাব আর কারো জন্য দিয়েছেন লোহা।

ফোকাহায়ে কেরাম তো এটাও বলেছেন যে, যে সমস্ত অঞ্চল জিহাদের মাধ্যমে বিজিত হয়েছে সেখানে খতীবগণ তলোয়ার হাতে খুতবা দিবেন; মানুষকে একথা জানান দেয়ার জন্য যে, এ এলাকাটির জয় তলোয়ারের মাধ্যমে হয়েছে। আর কেউ যদি ইসলাম ত্যাগ করতে চায় তাহলে সে যেন একথা ভেবে নেয় যে, এখনো মুসলমানদের হাতে ঐ তলোয়ার রয়েছে যা মুরতাদদের মস্তিস্ক ঠিক করে ফেলবে।

হে আমার ভাই,এ অস্ত্রকে ভালোবাস, তাকে কখনো পরিত্যাগ করো না। তুমি একটু পাকিস্তানের ইতিহাসের দিকে তাকাও! দেখ, যখন মুসলমানরা হিন্দুস্তান থেকে হিজরত করে পাকিস্তান আসছিল তার কিছুকাল পূর্বে হিন্দুরা মুসলমানদের থেকে এই বলে পুলিশের মাধ্যমে অস্ত্র তুলে নেয় যে, তোমাদের ব্যাপারে আমাদের আশংকা হচ্ছে তাই তোমাদের অস্ত্রগুলো আমাদের কাছে জমা দিয়ে দাও। আমরা তোমাদের নিরাপত্তা দেব। তখন অনেক সরলমনা মুসলমান তাদের কথায় অন্ধ বিশ্বাস করে নিজেদের অস্ত্র জমা দিয়ে দেয়। কিন্তু তারপর কী হয়েছিল ? সেই হিন্দুরাই শিখদের সাথে মিলে মুসলমানদের শহীদ করেছিল। নারীদের লাঞ্ছিত করেছিল। এই অস্ত্রের কারণেই লাখো মুসলমানের জীবনকে কুরবানী দিতে হয়েছিল।

আল্লাহ্কে ভয় করো! নিজেদের সন্তানদেরকে ইসলামের সঠিক ইতিহাস শিক্ষা দাও। তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দাও ইসলামের সোনালী যুগের কথা। হযরত ওমর রাযি. এর বিজয়ের ঘটনাগুলো শুনাও তাদেরকে। যখন মুসলিম জাতি ছিল উর্ধমুখী। মুসলমানরা ছিল জয়ী। মসজিদে আকসা ছিল আযাদ। মসজিদে আকসা যতবার আযাদ হয়েছে তলোয়ারের জোরেই হয়েছে।

প্রিয় ভাই, তোমার সন্তান মুজাহিদ হয়ে যাবে এটা কি লজ্জার বিষয়? মুজাহিদ হয়ে সে আত্মমর্যাদাশীল হবে। কেননা, যখন সে মুজাহিদ হবে তখন কাফেররা তার ভয়ে কাঁপতে থাকবে। কেউ আর আমাদের প্রিয় নবী সা. এর সাথে বেয়াদবি করার দুঃসাহস দেখাবেনা। কেউ কোরআনের অবমাননা করার চেষ্টাও করবেনা। তার সামনে তার মুসলিম বোনের গায়ে হাত দেয়ার কল্পনাও করবেনা। ভাই তোমার সন্তান ভীতু নয় সিংহের মত সাহসী বীর হওয়া চাই। গাঁধা নয় শক্তিশালী ঈগলের ন্যায় চৌকান হওয়া চাই। আর এমনটা তখনই সম্ভব যখন তার এক হাতে কলম ও অন্য হাতে তলোয়ার থাকবে। এবং অন্তরে থাকবে ঈমানী মূল্যবোধ, তার শিরা উপশিরায় দৌঁড়াবে ইসলামের প্রতি খাঁটি ভালোবাসার খুন।

তখন পৃথিবীর কোন শক্তিই আর মুসলমানদেরকে পরাজিত করতে পারবেনা। হয়ত এ কথাগুলো আজ তোমাদের কাছে অর্থহীন মনে হবে, কিন্তু আগামীতে একথাগুলোই তোমাদের কাছে বাস্তবে রূপান্তরিত হবে। সুতরাং তোমাদের সন্তানদেরকে কাফেরদের সন্তানদের সাথে মিশতে দিওনা। তাদেরকে কাফেরদের মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত কর। পরিশেষে শায়েখ আব্দুল্লাহ আয্যাম রহ. এর একটি উক্তি দিয়ে শেষ করছি- 'নিজের ঘরকে মুরগির খামার বানিওনা; বরং সিংহের গুহা বানাও। কেননা মুরগি যত বড়ই হোক না কেন এক দিন ছুড়ির নিচে তাকে জবাই হতে হবে।'

আমাদের বোধোদয় কবে হবে?

আবু আব্দুল্লাহ

সেই ছোটকাল থেকেই একটি ঘটনা শুনতে শুনতে বড় হয়েছি, তাতারীরা যখন বাগদাদ অবরোধ করে রেখেছিলে তখন বাগদাদের উলামায়ে কেরাম 'কাকের গোস্ত খাওয়া জায়েয, না জায়েয নয়' এই বিতর্কে ব্যস্ত ছিলেন।

প্রথমে প্রথমে এ ঘটনা অবিশ্বাস্য মনে হতো, কিন্তু এখন যখন আমাদের ছোট ছোট শাখাগত মাসআলা নিয়ে বাড়াবাড়ি দেখি তখন আর এ ঘটনা অবিশ্বাস্য মনে হয় না।

কাফেররা আফগানিস্তান-ইরাক, লিবিয়া-সিরিয়ায়, মালি- সোমালিয়া, ইয়েমেন-পাকিস্তানে সম্প্রসারণ বাড়াতে বাড়াতে কাশ্মীর-আসাম হয়ে আরাকানে আমাদের একেবারে নাকের ডগায় এসে উপস্থিত; তবুও আমাদের ইখতেলাফ শেষ হয় না। আমাদের ভূ-খন্ড যত বেশি আক্রান্ত হচ্ছে আমাদের ইখতেলাফ ততো বেড়ে চলছে।

কথায় আছে, 'হিন্দুদের বার মাসে তের পার্বন'!

আর আমাদের বার মাসে কতো ইখতেলাফ তা একমাত্র আল্লাহই ভালো জানেন।

মুসলিমবিশ্ব আক্রান্ত হবে তবুও আমাদের ইখতেলাফ শেষ হবে না! কাফেররা আমাদের নাকের ডগায় উপস্থিত হবে; তবুও আমরা ইখতেলাফ চালিয়ে যাবো। কসাই মোদী এসে এদেশকে কিনে নিয়ে যাবে তবুও আমাদের ইখতেলাফ ক্রমশ বাড়তে থাকবে। তাহলে কি আমাদের ইখতেলাফ ততোদিন চলবে যতদিন না দিল্লীর মুশরিক সেনাদের বুটের আওয়াজে আমাদের প্রভাতের ঘুম ভাঙ্গবে??

SHAYKH ANWAR AL AWLAKI (R.)
“মুসলিম উম্মাহ যখন ঘোরতর কঠিন সমস্যায় পতিত,
তখন আমাদের মোটেই উচিৎ নয় ছোটখাটো বিষয়গুলো নিয়ে
যুক্তি ও তর্কে লিপ্ত হওয়া।”

চিন্তাশীলদের জন্য এতে রয়েছে ভাবনার খোরাক

যুবায়ের হোসাইন

যে ব্যাপারটা আমার অত্যন্ত দুঃখজনক মনে হয় সেটা হল কাফের বা ইসলামবিদ্বেষীদের সাথে কথা বলার ক্ষেত্রে আমরা কেন যেন ডিফেনসিভ হয়ে যাই। যেখানে স্বয়ং আল্লাহ্ আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি বলে স্বীকৃতি দিচ্ছেন, সেখানে আমরা কেন কুফ্ফার শক্তির সামনে মাথা উঁচু করে চলতে পারি না, আমার বোধগম্য হয় না।

যেমন 'I am a Muslim and I am not a terrorist.' বাক্যটা বহুল প্রচারিত। আমি এ কথাটাকে খুবই অপছন্দ করি। কারণ এর মাধ্যমে যেন আমরা কাফেরদের কাছে করজোরে বলছি- 'বিশ্বাস কর আমি টেররিস্ট নই'। এরকম রক্ষণাত্মক আমরা কেন থাকব? টেররিসমের প্রশ্ন হলে 'মুসলিমরা সন্ত্রাসী নয়' বলে আত্মপক্ষ সমর্থন না করে আমাদের উচিত কুফ্ফারদের ধ্বংসযজ্ঞ ও হত্যার ইতিহাস, রাজনীতি তুলে ধরে বলা-'সন্ত্রাসীর বাপ তো আপনারা, অন্যকে সন্ত্রাসী বলার আপনি কে??'

আজকে হিজাব নিয়ে ইসলামবিদ্বেষীরা কটাক্ষ করলে মুসলিমরা 'হিজাব একটি বিজ্ঞানসম্মত বিষয়' জাতীয় প্রবন্ধ লেখাকে বুদ্ধিবৃত্তিক জবাব দেওয়া মনে করে। কিন্তু এটা কি কাফেরদের এন্টারটেইন করা হল না?? আমাদের বরং এসকল ইসলামবিদ্বেষীদের হিপোক্রেসি আর নারী-ব্যবসার চোখে আঙ্গুল তুলে বলা দরকার 'যারা মেয়েদের উলঙ্গ করে রাস্তায় ছেড়ে দেয়, তীব্র শীতের মধ্যেও কাপড় ছোট না করলে যেখানে মেয়েরা দাম পায় না; সেই লোকেদের নারীর অধিকার নিয়ে কথা বলার সাহস কী করে হয়??'

কাফেররা বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে বলার চেষ্টা করে। আমাদের ধর্মের কোন বিধানকে বিজ্ঞান দিয়ে তারা 'অযৌক্তিক' প্রমাণ করতে পারবে না সেটা তারাও জানে, আমরাও জানি। কিন্তু তারা আমাদের বিশ্বাসের ভিত্তিকে 'কুরআন' ও 'রিসালাত' থেকে সরিয়ে 'বিজ্ঞান' দিয়ে রিপ্লেস করতে চায় বিধায় সুকৌশলে কথায় কথায় বিজ্ঞান টেনে আনার প্রবণতা সৃষ্টি করার প্রয়াস পায়। অথচ তারা নিজেরাও কিন্তু বিজ্ঞানে বিশ্বাস করে না। তারা মদ খায় কেন? এটা কি বিজ্ঞানসম্মত? তারা যেসব যৌনাচার করে, সেসব কি বিজ্ঞান অনুমোদন দেয়? তারা হিজাবের ব্যাপারে ভিটামিন ডি এর প্রতিবন্ধকতার কথা বলে, কিন্তু শরীর খোলা রাখায় ক্যান্সারের সৃষ্টি নিয়ে যে লক্ষ লক্ষ জার্নাল প্রকাশিত হচ্ছে, সেই ব্যাপারে কথা বলে কি? আমরা কি এই ব্যাপারগুলো তুলে ধরতে পারি না?

মোটকথা, আমাদের রক্ষণাত্মক মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসা উচিত। কাফেরদের কাছে মুসলিমদের 'নির্দোষ', 'শান্তিপ্রিয়' প্রমাণের চেষ্টা না করে আমরা যেন তাদের ভন্ডামি আর নরপশুত্ব তুলে ধরে 'কাফেরদের প্রতি মুসলিমদের কেন এর চেয়েও কঠোর আচরণ করা উচিত'-তা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি। মানসিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়ে কাফেরদের বিরুদ্ধে জয়ী হওয়া সম্ভব নয়।

ইতিহাস কথাবলে...

হযরত নূহ আ. যখন কিস্তি তৈরি করছিলেন, তখন সে সময়ের কাফেররা তাঁকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টায় মেতেছিল। সাহাবায়ে কেরাম রাযি. যখন রোম পারস্য বিজয়ের কথা বলেছিলেন, তখন সে সময়ের কাফেররা তাঁদেরকে নিয়ে উপহাস করেছিল। নূহ আ. এর কিস্তি কি কাজে আসেনি? সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর কথার কি প্রতিফলন ঘটেনি? কিন্তু সেই সব হাসি-ঠাট্টা আর উপহাসকারীদের শেষ পরিণতি কী হয়েছিল?

ভারতীয় উপমহাদেশে বৃটিশ বেনিয়ারা যখন উলামায়ে কেরামদের ফাঁসীর কাষ্ঠে ঝুলাচ্ছিল, তখনো কিছু উলামা লেবাস ও নামধারী লোক স্বর্গসুখে ছিল। ওরা সর্বদা নিজেদের যুগের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান মনে করে। সংখ্যায় এবং ক্ষমতায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে।

কথায় নয়, কাজেই হবে তাদের মোকাবেলা- ইনশাআল্লাহ

জুলুমের পরিণাম................

ইতিহাসে এই বাস্তবতা বারবার পরিলক্ষিত হয়েছে যে, জালিমরা যখন তাদের জুলুমের রাজত্ব কায়েম করে, বেপরোয়াভাবে জুলুম চালিয়ে যায়, জুলুমের পথেই সে বিজয় খুঁজে; পতন তখনি তার চোখের সামনে দৃশ্যমান হয়। যে জুলুমকে সে ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার মাধ্যম বানায়, যেটাকে সে উত্থানের সোপান নির্ধারণ করে; সেটিই হয় তার পতনের সিঁড়ি।

এভাবেই পতন হয়েছিলো জালিম ফেরআউনের, যখন সে হযরত মুসা আলাইহিস সালামের পিছু ধাওয়াকে নিজের চূড়ান্ত বিজয় মনে করেছিলো।

এভাবে পতন হয়েছে আবু জাহলের, যখন সে ইসলামের কফিন রচনার প্রত্যয়ে ঔদ্ধত্যভাবে বদরপ্রান্তে গিয়েছিলো। এভাবে পতন হয়েছে হিটলার-মুসোলিনির। এভাবেই পতন হয়েছিল একদলীয় শাসনের। সুতরাং এ পথ বেয়েই অন্য জালিমের পতন আসবে।

যারা মানুষের মৌলিক অধিকারকে পণ্য বানায়, অধিকার যাই হোক। যারা মানুষের চলার পথ চুষে খায়, সে চলা যে পথেই হোক। যারা মানুষের রক্ত ও অশ্রুর উপর নিজের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করতে চায়। তাদেরকেই হিটলার-মুসোলিনি, ফেরআউন-আবু জাহলের পরিণাম স্বাগত জানায়। যদিও তারা এটাকে উত্থানের সোপান মনে করে, নিজের জুলুমের প্রাসাদকে শয়তানের বেহেশত মনে করে। প্রকৃতপক্ষে এটাই হয় তাদের জন্যে স্বহস্তে নির্মিত কবরের প্রথম পদক্ষেপ, যা ক্রমান্বয়ে গভীর হতে থাকে।

যে স্বহস্তে নিজের কবরকে যত গভীরভাবে খনন করবে, তাকে তত গভীরেই প্রোথিত করা হবে। একেবারে ইতিহাসে আস্তাকুড়েই তাকে দাফন করা হবে। ইতিহাস তাকে চেঙ্গিস-হালাকু খাঁ, হিটলার-মুসোলিনির তালিকায় স্থান দিবে।

সালাফদের জীবনী

স্মৃতির পাতায় আকাবির উলামা

আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ.

আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. মুজাহিদ, আলেম, আবেদ, যাহেদ, দানশীল, খোদাভিরু, এ সবগুলো পরিচয়েই সমানভাবে পরিচিত। একটাকে আর একটার চেয়ে প্রাধান্য দেওয়া কঠিন। তবুও তাঁর মুখ্য পরিচয় হিসেবে ইলম ও জিহাদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতেই হয়। অর্থাৎ, তাঁর মুখ্য পরিচয় হল তিনি তাঁর সময়ের অন্যতম শ্রে' আলেম ও শ্রেষ্ঠ মুজাহিদ। তাঁর ইলমের মজলিসে নানা দেশ থেকে হাজার হাজার ছাত্ররা এসে ভীড় করতো এবং তাকে এক নজর দেখার জন্য দূর দুরান্ত থেকে মানুষ ছুটে আসতো। অনুরুপভাবে জিহাদের ময়দান থেকে তাঁর ভয়ে শত্রু-পক্ষের অনেক বড় বড় বীর যোদ্ধারা ময়দান ছেড়ে পলায়ন করতো।

তাঁর ইলমের মজলিসের একটি ঘটনা : একবার বাদশাহ হারুনুর রশীদ তার স্ত্রীকে নিয়ে রাক্কায় ভ্রমণ করলেন। ঠিক ঐ সময়টাতে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক ও রাক্কায় অবস্থান করছিলেন। তাঁকে এক নজর দেখার জন্য, তাঁর ইলমের মজলিসে একটু সময় বসার জন্য হাজার হাজার মানুষ এসে ভীড় করল। এতো মানুষ এক জায়গায় ভীড় করতে দেখে বাদশা-পত্নী তার পাশে থাকা কাউকে জিজ্ঞাসা করল, কী হয়েছে এখানে এতো মানুষের ভীড় কেন ? তাকে বলা হল, এখানে খোরাসানের আলেম আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. এসেছেন। তাই তাকে দেখতে এতো মানুষের ভীড় হয়েছে। তখন বাদশা-পত্নী বলল, 'খোদার কসম বাদশাহী তো এটাকেই বলে।'

দেখুন, তাঁর মৃত্যুর সংবাদ শুনে স্বয়ং বাদশাহ হারুনুর রশীদ কী বললেন । ১৮১ হিজরিতে জিহাদ থেকে ফেরার পর রমজান মাসের কোন একদিন তাঁর ইন্তেকাল হল। তাঁর ইন্তেকালের সংবাদ শুনে বাদশাহ হারুনুর রশীদ বলেন, 'আল্লাহর কসম সাইয়্যিদুল উলামার ইন্তেকাল হল'

এবার আসুন জিহাদের ময়দানে তাঁর কিছু বিরত্বের কথা নিয়ে আলোচনা করি।

উবাদা ইবনে সুলাইমান বলেন এক যুদ্ধে আমি আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. এর সাথে ছিলাম। উভয় বাহিনী মুখোমুখি দাঁড়ানোর পর শত্রু-পক্ষের এক লোক অগ্রসর হয়ে দ্বন্দ যুদ্ধের আহ বান করল। অতঃপর মুসলমানদের এক লোক অগ্রসর হতেই সে তাকে হত্যা করে ফেলে। এভাবে তিনজন শহীদ হওয়ার পর মুসলমানদের মধ্য থেকে কাপড়ে চেহারা ঢাকা এক বীর যোদ্ধা এগিয়ে গেলেন এবং অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে হত্যা করে ফিরে এলেন। অতঃপর লোকেরা তাকে ঘিরে ধরল; কিন্তু মুখের উপর কাপড় থাকার কারণে তাকে চেনা যাচ্ছিল না। তখন আমি তার কাপড় ধরে টান দিয়ে মুখের কাপড় সরিয়ে দেখি ইনি আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ.।

আরেকটি ঘটনা :

আব্দুল্লাহ ইবনে সিনান বলেন, আমি একবার আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. এর সাথে তারতুসে অবস্থান করছিলাম। ইতিমধ্যে জিহাদের ডাক এসে গেল। তখন তিনি জিহাদে বের হয়ে গেলেন। অতঃপর দুই বাহিনী মুখোমুখি অবস্থান নেওয়ার পর শত্রু শিবির থেকে এক লোক অগ্রসর হয়ে দ্বন্দ যুদ্ধের আহ বান করল। তখন এক মুসলিম যোদ্বা সামনে অগ্রসর হল, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই শহীদ হলেন। এরপর সে আবারও দ্বন্দ যুদ্ধের আহ বান করল। এভাবে একে একে ছয় জনকে হত্যা করার পর দুই বাহিনীর মাঝখানের ফাঁকা জায়গায় বুক ফুলিয়ে তরবারীউচিয়ে অহংকারের সাথে ছুটাছুটি করতে লাগল আর মুসলমানদের দ্বন্দ যুদ্ধের আহ বান করছিল। কিন্তু কেউ সামনে অগ্রসর হচ্ছিল না। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. সামনে অগ্রসর হয়ে তাকে হত্যা করলেন এবং একইভাবে কাফেরদের থেকেও ছয়জনকে হত্যা করার পর যখন আর কেউ সামনে আসার সাহস পাচ্ছিল না তখন তিনি দ্রুত ঘোড়া নিয়ে দূরে নির্জন এক জায়গায় চলে গেলেন। তখন আমি তার পিছে পিছে গেলাম। আমাকে দেখে তিনি বললেন, আব্দুল্লাহ! তোমার কাছে আমার অনুরোধ, আমার এ কথা কাউকে বলবে না। অন্ততপক্ষে আমার জীবদ্দশাতে নয়।

আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. ইলম অর্জন ব্যতীত বসে থাকাকে পছন্দ করতেন না। তাকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আপনি আর কত ইলমের জন্য ছুটবেন ? তিনি বলেছিলেন ইনশাআল্লাহ মৃত্যু পর্যন্ত।

তিনি ঐ সকল লোকদের ব্যাপারে বলতেন যারা ইলম অর্জনে গাফেল- 'ইলম অর্জন ব্যতীত মানুষ কিভাবে মহৎ হতে চায়।'

অনুরুপভাবে তিনি জিহাদ ব্যতীত ঘরে বসে থাকাকে ঘৃণা করতেন। তাইতো তিনি ইলম অর্জনের জন্য যে এলাকাতেই ভ্রমণ করেছেন, আর সেখানে জিহাদের ডাক এসেছে; তিনি সব কাজ ফেলে আগে জিহাদে শরীক হয়েছেন।

তিনি জিহাদ ছেড়ে ঘরে বসে ইবাদতরত দরবেশদের তিরস্কার করে বলেন,

أيها الناسك الذي لبس الصوف *** وأضحي يُعد في العباد
إلزم الثغر والتعبد فيه
ليس بغداد مسكن الزهاد إن بغداد للملوك محل *** مناخ
للقارئ الصياد

হে দামী পশমী কাপড় পরিধানকারী এবং কুরবানির গোস্ত বক্ষণকারী আবেদ- দরবেশ ! সিমান্তে গিয়ে ইবাদত বন্দেগী কর, বাগদাদ তো যাহেদ-দরবেশদের থাকার জায়গা না। বাগদাদ তো রাজা-বাদশা আর চাটুকারদের স্থান।

আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. একবার এক সিমান্তবর্তী অঞ্চল থেকে আবেদুল হারামাইন নামে পরিচিত বিখ্যাত সূফী ফুযাইল ইবনে ইয়াজ রহ. কে উদ্দেশ্য করে একটি চিঠিতে লিখেন,

---

ياعابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب

ওহে আবেদার হারামাইন (মক্কা মদীনায় ইবাদতকারী) ! তুমি যদি আমাদের ইবাদত দেখতে তাহলে বুঝতে পারতে আমাদের ইবাদতের তুলনায় তোমার ইবাদতগুলো খেলনা-ছলনা মাত্র।

من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب

ইবাদতের অতিশয্যে (তোমাদের) অশ্রু দিয়ে গাল ভিজে , আর আমাদের গ্রীবা রক্তে রঞ্জিত হয়।

أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب

তোমাদের ঘোড়া গুলো বেহুদা বোঝা বহন করতে করতে ক্লান্ত হয় , আর আমাদের ঘোড়া গুলো যুদ্ধের দিন ভোর বেলা যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত হয়।

ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب

তুমি যখন ইবাদত করতে বস, তখন মেশকের সুগন্ধি ব্যবহার করে বস। আর আমাদের সুগন্ধি হচ্ছে, ঘোড়ার পদাঘাতে নির্গত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এবং যুদ্ধের ময়দানের ধুলা বালি।

لقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب

আর যেন রাখ! আমাদের ধুলাবালি সম্পর্কে আমাদের কাছে নবীজীর সত্য সঠিক বাণী এসেছে, যা কখন মিথ্যা হওয়ার নয়। আর তা হচ্ছে,

لا يستوي وغبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب

'যুদ্ধের ময়দানের ধুলা বালি আর জাহান্নামের প্রজ্জলিত আগুনের ধোঁয়া কোন ব্যক্তির নাকে কখনই একত্রি হবে না।'

هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بمية لايكذب

আর কিতাবুল্লাহ আমাদের ব্যাপারে এই বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছে, 'শহীদরা মৃত নয়।' আর কিতাবুল্লাহ কখনও মিথ্যা বলে না।

ফুযাইল ইবেন ইয়ায রহ. এর নিকট যখন এই চিঠি পৌছল তখন তিনি এই চিঠি পড়ে অশ্রুসিক্ত অবস্থায় বলেন, আবু আব্দুর রহমান ঠিকই বলেছে এবং আমাকে সৎ উপদেশ দিয়েছে।

বদরের যুদ্ধ

বদর যুদ্ধ ছিল ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম প্রধান একটি যুদ্ধ। ইসলামী ইতহাসের মহান সকল যুদ্ধই এর ওপর প্রতিষ্ঠিত। শুধু তাই নয় পুরো ইসলামই তো বদর যুদ্ধের ওপর দাঁড়ানো। তাই রাসূল সা. এর যুদ্ধাভিজানের সিরিজ আলোচনা বদর যুদ্ধ দিয়েই শুরু করছি।

কুরাইশদের অর্থনৈতিক শক্তির মূলে ছিল, সিরিয়ার সাথে তাদের শক্তিশালী বাণিজ্যিক সম্পর্ক। এই অর্থনৈতিক দম্ভ-অহংকার এবং এ শক্তির কারণেই তারা রাসূল সা. এবং সাহাবীদের মক্কা থেকে উৎপীড়ন করে তাড়িয়ে দিতে পেরেছিল।

সুতরাং কুরাইশরা যদি অর্থনৈতিকভাবে আরো শক্তিশালী এবং আরো মজবুত হতে পারে তাহলে নিঃসন্দেহে তারা মদীনায় আক্রমণ করে বসবে এবং সবে মাত্র গজে উঠা ইসলাম-বৃক্ষকে সমূলে উপড়ে ফেলবে এবং পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে ইসলামকে মুছে ফেলবে।

প্রকৃতপক্ষে কুরাইশদের পরিকল্পনাও ছিল এমনই। আর রাসূলুল্লাহ সা. এর জন্য এ বাস্তব সত্যটা উপলব্ধি করা মোটেও কঠিন কিছু ছিল না; বরং তিনি এ বিষয়টা আগ থেকেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। একারণেই রাসূল সা. যখন শুনতে পেলেন 'কুরাইশরা আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে একটি বাণিজ্যিক কাফেলা সিরিয়ায় প্রেরণ করছে। তখন সাথে সাথে একশ পঞ্চাশ অথবা দুইশ জনের বাহিনী নিয়ে বেরিয়ে পড়লেনে কুরাইশদের বাণিজ্যিক কাফেলাকে আটকে দিতে। কিন্তু রাসূল সা. উশাইরা নামক স্থানে পৌঁছার আগেই আবু সুফিয়ান তার কাফেলা নিয়ে এ স্থান অতিক্রম করে অনেক দূরে চলে গিয়েছিল। তাই রাসূল সা. সেখানে কিছুদিন অবস্থান করে মদীনায় ফিরে আসেন। অতঃপর যখন আবু সুফিয়ানের কাফেলা শাম থেকে মক্কার দিকে ফিরে আসার সময় হল, রাসূলুল্লাহ সা. তখন কুরাইশ-কাফেলার গতিবিধি লক্ষ করার জন্য তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ এবং সাঈদ ইবনে যায়েদ রাযি. কে মদীনার পশ্চিমে সমুদ্র তীরের দিকে পাঠালেন। তারা দুজন হাতরা নামক স্থানে এসে কুরাইশ কাফেলার ফিরে আসার অপেক্ষা করতে লাগলেন

.هذه عير قريش فيها أموالهم فأ خرجوا إليها لعَّل الله ينفلكموها

'এই তো কুরাইশদের কাফেলা। এতে তাদের প্রচুর ধন-সম্পদ আছে। সুতরাং তোমরা এর উপর আক্রমণ কর। হতে পারে আল্লাহ তাআলা গণিমত হিসেবে তোমাদেরকে তা দান করবেন।'

মুসলিম বাহিনীর মদীনা ত্যাগ

যেহেতু বড় কোন সৈন্যবাহিনী অথবা মক্কার বড় কোন বাহিনীর সাথে মোকাবিলার আশংকা ছিল না তাই তিনি কাউকে নির্দিষ্টভাবে বের হতে বলেননি; বরং এটা সকলের ইচ্ছাধীন রেখেছিলেন। যার ইচ্ছা বের হবে, যার ইচ্ছা মদীনায় রয়ে যাবে। কোন ধরণের বাধ্যবাধকতা নেই।

রাসূলুল্লাহ সা. এবং তাঁর সাথে তিনশত তের মতান্তরে চোদ্দ কিংবা সতের জন সাহাবী খুব দ্রুত প্রস্তুতি নিয়ে বের হয়ে গেলেন। এতো তাড়াহুড়া, দ্বিতীয়ত বড় কোন যুদ্ধের আশংকা না থাকায় প্রস্তুতি তেমন ভাল হয়নি এবং যুদ্ধ সরঞ্জামও একেবারে নেই বললেই চলে। পুরো মুসলিম বাহিনীর সাথে মাত্র সত্তরটি উট এবং এক দুইটি ঘোড়া ছিল। একেকটি উটের পিঠে পালাক্রমে তিন চারজন করে লোক আরোহণ করছিল। কোন ধরণের বাধ্যবাধকতা না থাকায় অনেকে মদীনায় রয়ে যান। তাই তাদের ইমামতির জন্য ইবনে উম্মে মাকতুম রাযি.কে নির্ধারণ করা হয়।

এদিকে বাহিনী রওহা নামক স্থানে পৌঁছলে সেখান থেকে আবু লুবাবা ইবনে আব্দুল মুনজিরকে মদীনার খলীফা নিযুক্ত করে তাকে সেখান থেকে মদীনায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

বদর অভিমুখে ছুটেছে কাফেলা

এরপর মুসআব ইবনে উমায়েরের হাতে পুরো বাহিনীর পক্ষ থেকে সাদা রঙ্গের একটি পতাকা তুলে দেওয়া হয়। অতঃপর আনসার ও মুহাজিরদের দুই ভাগে ভাগ করে আনসারদের পতাকা দেওয়া হয় সাদ ইবনে মুআজ রাযি.কে এবং মুহাজিরদের পতাকা দেওয়া হয় আলী ইবনে আবু তালিব রাযি.কে। এই দুই পতাকা ছিল কাল রঙের। এরপর রাসূল সা. এই নিঃসম্বল বাহিনী নিয়ে মদীনার গিঁড়িপথ ধরে বদরের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন।

এবং সদরা নামক স্থানে পৌঁছে বাছবাছ ইবনে আমর আল জুহানী এবং আকী ইবনে আবু জাগবা আল জুহানী নামক দুইজনকে গুপ্তচর হিসেবে আবু সুফিয়ানের সংবাদ নেওয়ার জন্য বদরের দিকে প্রেরণ করেন।

এদিকে আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে কুরাইশদের কাফেলাটি খাদ্য ও অস্ত্র-সম্ভারে নিয়ে মক্কায় ফেরার পথে মদীনার নিকটবর্তী উপকূলীয় এলাকা অতিক্রম করছিল। আবু সুফিয়ান খুবই বিচক্ষণতা ও সতর্কতার সাথে সামনে অগ্রসর হচ্ছিল। পথে একে ওকে জিজ্ঞাসা করছিল মদীনার মুসলমানদের পক্ষ থেকে কোন ধরণের হামলার আশংকা আছে কি না? কেননা এ বিপুল খাদ্য ও অস্ত্র-সম্ভার শত্রুপক্ষের হাতে চলে গেলে কুরাইশের ভাগ্য বিপর্যয় অনিবার্য হয়ে পড়বে। এবং এর দায়ভার তাকেই বহন করতে হবে। এভাবে তারা যখন বদরের নিকটবর্তী একটি পাহাড়ের নিকট পৌঁছল, তখন মাজদিয়া ইবনে আমর নামক এক লোকের সাথে দেখা হল। তাকে মদীনার বাহিনী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, এমন কোন বাহিনী দেখিনি তবে দুইজন লোককে এ টিলার উপর তাদের উট থেকে নামতে দেখেছি। তারা সেখানে নেমে পানি পান করে আবার চলে গেছে। তখন আবু সুফিয়ান খুব দ্রুত সে দিকে গেল এবং সেখানে পড়ে থাকা উটের গোবর নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার পর বুঝতে পারলো এর মধ্যে যে খেজুরের বীচি আছে এগুলো মদীনার খেজুরের বীচি। তখন তিনি দ্রুত স্থান ত্যাগ করে সমুদ্র তীরবর্তী অন্য একটি পথ নিল। এবং কুরাইশদের কাছে জরুরী সাহায্যের বার্তাসহ জমজম ইবনে আমর আল গিফারী নামক এক লোককে ভাড়া করে দ্রুতগামী সওয়ারী দিয়ে মক্কায় পাঠালো।

সে খুব দ্রুত মক্কার উপকণ্ঠে এসে উটের কান দুটো কেটে হাওদা উল্টোমুখো করে এবং নিজের পোশাকে রক্ত মেখে এক অভিনব সাজে মক্কায় প্রবেশ করলো। ফলে মক্কায় খুব দ্রুত কানকাটা সওয়ারের আগমণ সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো। এবং মূহূর্তের মধ্যে কৌতুহলী মানুষের ভিড় জমে গেলো। আর সে জনতার সামনে তাদের কাফেলার বিপদে পড়ার সংবাদ দিল এভাবে-

يا معشر قريش! أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه، لاأرى أن تدركوها: الغوث، الغوث.

'হে কুরাইশ সম্প্রদায়! তোমাদের কাফেলা মুহাম্মদের হামলার মুখে রয়েছে। নিজেদের সম্পদ যদি রক্ষা করতে চাও তাহলে এই মুহূর্তে সাহায্যের জন্য ছুটে চল।'

মক্কাবাসীরা এ সংবাদ পেয়ে খুব দ্রুত প্রস্তুত হয়ে আবু জাহেলের নেতৃত্বে বের হয়ে গেল। তখন মক্কাবাসীদের অবস্থা ছিল এই- হয়তো নিজে বের হবে অথবা তার পক্ষ থেকে অন্য একজনকে পাঠাবে। আবু লাহাব ব্যতীত কুরাইশদের প্রায় সকল নেতাই বের হয়েছিল।

আবু লাহাব তার পক্ষ থেকে অন্য একজনকে পাঠিয়েছিল। অন্য দিকে বনী আকী ব্যতীত মক্কার আসে-পাশে থাকা সকল গোত্র থেকেই কেউ না কেউ এই যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে তাদের সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় তেরশত। এর মধ্যে ছিল একশ অশ্বারোহী এবং সাতশ বর্ম পরিহিত যোদ্ধা। তাদের সাথে ছিল অসংখ্য উট। বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল আবু জাহেল এবং তার সহযোগী হিসেবে ছিল আরো নয়জন কুরাইশ নেতা।

এদিকে আবু সুফিয়ান ঘুরপথে নিরাপদে মক্কায় পৌঁছে গেল এবং আবু জাহেলকে ফিরে আসার বার্তা দিয়ে দ্রুতগামী সওয়ার পাঠালো। যখন কুরাইশ বাহিনীর নিকট আবু সুফিয়ানের এই বার্তা পৌঁছল তখন তারা মক্কায় ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা করল। কিন্তু অহংকারী, নিষ্ঠুর, নৃশংস আবু জাহেল দাঁড়িয়ে বলল, 'আল্লাহর কসম! আমরা বদর প্রান্তরে ঘুরে আসা ব্যতিত মক্কায় ফিরে যাব না। আমরা সেখানে তিন দিন থেকে মদ আর নারী নিয়ে নেচে গেয়ে ফুর্তি করবো এবং উট জবাই করে খাবো। যাতে করে পুরো আরবের লোকেরা আমাদের বিরত্বের কথা জানতে পারে এবং চিরজীবন আমাদের ভয় করে চলে, আর আখনাস ইবনে শারীক আবু জেহেলের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে বিপরীত মত দিল। কিন্তু কুরাইশরা তার এই পরামর্শ মানল না। তাই সে এবং তার মিত্র বনী জুহরা সেখান থেকে মক্কায় ফিরে গেল। তারা বদরে অংশ গ্রহণ করেনি। তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় তিন শত। অতঃপর বনু হাশেমও ফিরে আসতে চাইলো। কিন্তু আবু জাহেল তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করে তাদেরকে থাকতে বাধ্য করল। ফলে কুরাইশরা এক হাজার সৈন্য নিয়ে বদরের দিকে রওয়ানা হল।

রাসূল সা. ওয়াদিয়ে যাফিরন নামক স্থানে থাকা অবস্থায় তাঁর কাছে কুরাইশদের সমর সজ্জায় সজ্জিত হয়ে বদরের দিকে অগ্রসর হওয়ার সংবাদ এলো। কুরাইশদের অগ্রসর হওয়ার সংবাদ নিয়ে চিন্তা-গবেষণার পর তাদের মোকাবিলার সিদ্ধান্ত ছাড়া অন্য কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার কোন সুযোগ ছিলনা। কেননা কুরাইশদের যদি এভাবে বিনা বাঁধায় বদরের প্রান্তরে অবস্থান করতে দেওয়া হয়, তাহলে পুরো আরবের মধ্যে কুরাইশদের একটা প্রভাব ও দাপট সৃষ্টি হবে এবং মুসলমানদের দুর্বলতার কথা প্রকাশ পাবে। মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ রাখে তখন এমন যে কোন গোত্রই মদীনায় আক্রমণের সাহস দেখাবে। অন্য দিকে এ নিশ্চয়তাও তো নেই যে, কুরাইশরা বদর থেকে ফিরে যাবে, মদীনায় এসে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করবে না।

এ সকল বিষয়কে সমনে রেখে রাসূলুল্লাহ সা. সাহাবীদের সাথে পরামর্শে বসলেন যে, এ পরিস্থিতিতে কী করা যায়। অর্থাৎ কুরাইশদের মুখোমুখি হবে, না মদীনায় ফিরে যাবে। তখন মুহাজিরদের পক্ষ থেকে আবু বকর এবং ওমর রাযি. অগ্রসর হয়ে কাফেরদের মোকাবেলা করার পক্ষে মত দিলেন। অতঃপর মিকদাদ ইবনে আমর রাযি. দাঁড়িয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল আপনি তাই করবেন যা আল্লাহ আপনাকে নির্দেশ দেন। আল্লাহর কসম আমরা ঐরকম কথা বলব না যে রকম বনী ইসরাইলরা মুসা আ. কে বলেছিল। কুরআনের ভাষায়-

قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ

'তারা বলল, হে মুসা আমরা কখনো সেখানে প্রবেশ করবো না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সেখানে বিদ্যমান থাকবে। অতএব, আপনি ও আপনার পালনকর্তাই যান এবং উভয়ে যুদ্ধ করে নিন। আমরা এখানেই বসে আছি।' (সুরা মাইদা-২৪)

কিন্তু আমরা বলবো, আপনি আপনার প্রভুর নির্দেশ নিয়ে অগ্রসর হোন এবং যুদ্ধ করুন; আমরাও আপনার সাথে যুদ্ধ করবো।
এ সকল প্রতিশ্রুতি তো ছিল মুহাজিরদের পক্ষ থেকে। কিন্তু আনসাররা কী বলে তা তো তিনি এখনো শুনেন নি। তাই রাসূল সা. আনসারদের পক্ষ থেকে কিছু শুনতে চাচ্ছিলেন। কারণ তারা ছিল সংখ্যায় বেশী এবং মুহাজিররা ছিল সংখ্যায় কম। অন্যদিকে আকাবার চুক্তিতে সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, মদীনার অভ্যন্তরে যতদিন মহা নবী সা. থাকবেন ততদিন আনসারগণ তাকে সাহায্য করবেন। কিন্তু এখন তো তিনি মদীনার বাইরে। তাই রাসূল সা. বললেন,

أشيروا علي أيها الناس

'হে লোকসকল! আমাকে পরামর্শ দাও।'

তখন আনসারদের পতাকাবাহী সাদ ইবনে মুআজ রাযি. বুঝতে পারলেন রাসূল সা. এ কথার মাধ্যমে কাদের উদ্দেশ্য নিচ্ছেন। তখন তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল সা. আপনি কি আমাদের সিদ্ধান্ত জানতে চাচ্ছেন? রাসূল সা. বললেন, হ্যাঁ।
তখন সাদ রাযি. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সা. আপনার উপর আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস আছে এবং আমরা শপথ নিয়েছি যে আপনি যা বলবেন আমরা তা শুনবো এবং মান্য করবো। সুতরাং এখন আপনি যে সিদ্ধান্ত নিবেন আমরা সে সিদ্ধান্তের পক্ষে থাকবো। ঐ সত্তার কসম করে বলছি যিনি আপনাকে সত্যবাণী দিয়ে পাঠিয়েছেন; যদি আপনি আমাদের (নিকটের) ঐ সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলেন আমরা তা করবো এবং সেখানে যদি আপনি ডুব দেন আমরাও আপনার সঙ্গে ডুব দেব। আমাদের একজনও পিছপা হবে না। আগামীকাল শত্রুর মুখোমুখি হতে আমাদের কোন দ্বিধা নেই। আমরা যুদ্ধবিদ্যায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং যুদ্ধকর্মে আমাদের বিশ্বস্ততার কথা সকলেই জানে। যুদ্ধক্ষেত্রে আল্লাহ আমাদের কর্মদক্ষতা আপনাকে দেখাবেন বলে আমরা আশা করি এবং আমরা বিশ্বাস করি যে, আমাদের একাগ্রতা ও একনিষ্ঠতা দেখে আপনার চোখে স্নিগ্ধতা নেমে আসবে।'
এ কথায় রাসূল সা. খুবই আনন্দিত হলেন এবং বললেন,

سيروا وابشروا فإن الله تعالى قد وعدني احدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر الى مصارع القوم

'তোমরা এগিয়ে যাও এবং উৎফুল্ল হও যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে দুই দলের একটির ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্লাহর কসম! এখনই আমার চোখে ভাসছে যে শত্রুরা আমাদের পদতলে শায়িত রয়েছে।
এরপর রাসূল সা. সাহাবীদের নিয়ে বদরের দিকে রওয়ানা হলেন এবং বদরের নিকবর্তী এক স্থানে এসে যাত্রা বিরতি করলেন। রাসূল সা. আবু বকর রাযি.কে সঙ্গে নিয়ে মক্কা থেকে আগত বাহিনীর গতিবিধি লক্ষ করার জন্য বের হয়ে গেলেন। এরপর সন্ধায় আবারও আলী ইবনে আবি তালিব, যুবায়ের ইবনে আওয়াম এবং সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযি. কে কুরাইশ বাহিনীর খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য পাঠালেন। তাঁরা বদরের কূপের নিকট থেকে কুরাইশ বাহিনীর পানি সংগ্রাহক দুই লোককে ধরে আনেন। রাসূল সা. তখন নামাজ পড়ছিলেন। সাহাবীরা তাদের পরিচয় জানতে চাইলে তারা বলল, আমরা কুরাইশদের পানি সংগ্রাহক।

কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম একথা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না, কারণ তাদের ধারণা ছিল আবু সুফিয়ান কাফেলা নিয়ে এখনও এ অঞ্চল অতিক্রম করে নি। বরং তারা আশপাশেই কোথাও আছে। এবং এরাও আবু সুফিয়ানের কাফেলার কেউ হবে তাই তাঁরা ভাবলেন এরা মিথ্যা বলছে। এরা আবু সুফিয়ানেরই লোক। তাই তাদের প্রহার করে জিজ্ঞাসা করলেন, সত্যি করে বল তোরা আবু সুফিয়ানের লোক না ?। অতঃপর তারা বলল, হ্যাঁ আমরা আবু সুফিয়ানের লোক। অতঃপর তাদের প্রহার বন্ধ করা হল। তখন রাসূল সা. নামাজ শেষ করে বললেন, তারা যখন সত্য বলছিল তখন তোমরা বিশ্বাস করনি আর যখন মিথ্যা বলেছে তখন বিশ্বাস করেছো। অতঃপর রাসূল সা. তাদের কাছে কুরাইশের খবর জিজ্ঞাসা করলেন। তারা বলল, এই তো তারা এই পাহাড়ের ওপাশে। তারপর বললেন, বল তারা কত জন এসেছে? তারা বলল আমরা জানি না। রাসূল সা. বললেন, তারা প্রতিদিন কতটি উট জবাই করে? তারা বলল, এক দিন নয়টা একদিন দশটা। রাসূল সা. বললেন, তারা সংখ্যায় নয়শত থেকে এক হাজার। এরপর রাসূল সা. তাদের কাছে জানতে চাইলেন, কুরাইশদের কোন কোন নেতা এসেছে? তারা আবু জাহেলে, উতবা, শাইবা, উমাইয়া ইবনে খালফ, নজর ইবনে হারেছসহ সকল নেতার নামই বলল। তখন রাসূল সা. সাহাবাদের উদ্দেশ্য করে বললেন,

هذه مكة قد ألقت اليك م أفلاذ كبدها.

'এই তো, মক্কা তার কলিজার টুকরাদের তোমাদের কাছে অর্পন করেছে।
রাসূল সা. বাহিনী নিয়ে পাহাড় অতিক্রম করে কিছুটা উত্তর দিকে বদরের একটি কূপের পাশে অবস্থান নিলেন। তখন লুহবাব ইবনে মুনজির, তিনি সামরিক বিশেষজ্ঞ ছিলেন। রাসূল সা. কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল সা. আমরা কি আল্লাহ তাআলার নির্দেশে এখানে অবস্থান নিয়েছি যে, আমরা এখান থেকে সরতে পারবো না, নাকি যুদ্ধ- কৌশলের কারণে আমরা এখানে অবস্থান নিয়েছি, রাসূল সা. বললেন,

بل هو الرأى و الحرب و المكيدة

বরং যুদ্ধ কৌশলের কারণে।
তখন সে বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল সা. আমাদের আরো অগ্রসর হয়ে শত্রু বাহিনীর পানির কূপগুলোর কাছাকাছি অবস্থান নেওয়া উচিত, যাতে আমরা তাদের পানিগুলো নষ্ট করে দিতে পারি এবং নিজেদের জন্য একটি জলাধার নির্মাণ করে তা পানি দিয়ে পূর্ণ করতে পারি; যাতে যুদ্ধ চলাকালে আমরা প্রায়েজনীয় পানি সংগ্রহ করতে পারি আর শত্রুরা কোন পানি সংগ্রহ করতে না পারে। তখন রাসূল সা. বললেন,

لقد اشرت بالرأى

(হ্যাঁ) তুমি সঠিক পরামর্শই দিয়েছ।

অতঃপর রাসূল সা. সৈন্য বাহিনী নিয়ে মধ্যরাতের দিকে শত্রুদের পানির একেবারে নিকটে এসে অবস্থান নিলেন। এবং নিজেদের জন্য একটি জলাধার নির্মাণ করলেন । আর শত্রুর পানির কূপগুলো ধ্বংস করে দিলেন। অতঃপর সাদ ইবনে মুআজ রাযি. একটি সামরিক হেড কোয়াটার নির্মাণের প্রস্তাব করলেন।

যেখান থেকে রাসূল সা. যুদ্ধ পর্যবেক্ষণ করতে পারেন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ দিতে পারেন। এক কথায় যুদ্ধ পরিচালনা করতে পারেন। রাসূল সা. এমন প্রস্তাবের জন্য তার প্রশংসা করে তার জন্য দোআ করলেন। যুদ্ধের ময়দানের উত্তর-পূর্ব পার্শ্বে একটি টিলার উপর যুদ্ধ পচািলনার জন্য সামরিক হেড কোয়াটার নির্মাণ করা হল। এবং সাদ ইবনে মুআজ রাযি. এর নেতৃত্বে রাসূল সা. এর জন্য একটি দেহরক্ষীদল গঠন করা হল। অতঃপর রাসূল সা. পাশের একটি গাছের কাছে নামাজে দাঁড়ালেন এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযি. পরম প্রশান্তিতে ভোর পর্যন্ত ঘুমালেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ

'যখন তিনি আরোপ করেন তোমাদের উপর তন্দ্রাচ্ছন্ন তা নিজের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রশান্তির জন্য এবং তোমাদের উপর আকাশ থেকে পানি অবতরণ করেন, যাতে তোমাদিগকে পবিত্র করে দেন এবং যাতে তোমাদের থেকে অপসারিত করে দেন শয়তানের অপবিত্রতা। আর যাতে করে সুরক্ষিত করে দিতে পারেন তোমাদের অন্তরসমূহকে এবং তাতে যেন সুদৃঢ় করে দিতে পারেন তোমাদের পাগুলো।' (সূরা আনফাল ১১)

পর দিন তথা দ্বিতীয় হিজরীর ১৭ রমজান ঊষালগ্নের সঙ্গে সঙ্গেই রাসূল সা. সাহাবীদেরকে শ্রেণীবদ্ধ করতে লাগলেন আর তখনই একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। রাসূল সা. তাঁর হাতের তীর দিয়ে কাতার সোজা করছিলেন। এমন সময় সাওয়াদ ইবনে গাজিয়্যা রাযি. বার বার আগে বেড়ে যাচ্ছিলেন। তখন রাসূল সা. তাঁর হাতের তীর দিয়ে তার পেটে ধাক্কা দিয়ে বললেন,

استويا سواد

'সাওয়াদ! কাতার সোজা কর। তখন সাওয়াদ রাযি. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল আপনি আমাকে ব্যাথা দিয়েছেন। সুতরাং আমাকে বদলা নিতে দিন। তখন রাসূল সা. তাঁর পেটের কাপড় সরিয়ে বললেন, নাও তীর দিয়ে খোঁচা দিয়ে আমার থেকে বদলা নাও। (কারণ তখন তার পেটে কাপড় ছিলনা) তখন সাওয়াদ রাযি. নবীজির কাছে এসে তাঁর পেট মুবারকে চুমু খেলেন। তখন রাসূল সা. বললেন,

!ماحملك علي هذا ياسواد

'সাওয়াদ কী হল! এমনটি করলে যে? সাওয়াদ রাযি. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল যুদ্ধতো লেগেই যাচ্ছে। তাই আমি চাইলাম সর্বশেষ আপনাকে একটু ছুঁয়ে যাই।

মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা কম ছিল। কিন্তু তাঁরা সকলেই আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত ছিলেন এবং রাসূলের নির্দেশে তারা সংঘবদ্ধ ও দৃঢ়চিত্ত ছিলেন। শ্রেণীবিন্যাস হয়ে গেলে যুদ্ধ শুরুর পূর্বে মহানবী সা. সৈন্যদের সর্বশেষ নির্দেশ দিলেন, শত্রুপক্ষ নিকটবর্তী হলে তীর নিক্ষেপ করবে তবে দূরে থাকতে নয়।

তারা আক্রমণ না করলে তোমরা আক্রমণ করবে না, অতঃপর রাসূল সা. যুদ্ধ পরিচালনার জন্য তাঁর হেডকোয়াটারে চলে গেলেন। তাঁর সাথে ছিলেন আবু বকর রাযি. এবং সাদ ইবনে মুআজ রাযি. এর দল।

এদিকে শত্রু শিবিরে এক হাস্যকর ঘটনা ঘটল। তা হল, নির্বোধ আবু জাহেল আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করে বলল, 'হে আল্লাহ! সে আমাদের আত্মীয়তার বন্ধনে ফাঁটল সৃষ্টি করেছে এবং এমন এক দীন নিয়ে এসেছে যা আমরা জানি না। হে আল্লাহ! আগামীকাল তাকে লাঞ্ছিত ও অপদস্ত কর। হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে যে, আপনার নিকট প্রিয় ও যাকে আপনি ভালবাসেন তাকেই বিজয় দান করুণ। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করে বলেন,

إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ

(হে কাফের সম্প্রদায়) 'তোমরা যদি সত্যের বিজয় চাও, বিজয় তো তোমাদের সামনেই এসেছে, তোমরা যদি এখনো (মুসলমানদের অনিষ্টকরণ হতে) বিরত থাকো, তবে তা তোমাদের পক্ষেই কল্যাণকর, আর যদি পুনরায় তোমরা এরকম কাজ কর, তবে আমিও তোমাদেরকে পুনরায় শাস্তি দিবো, আর তোমাদের বিরাট বাহিনী তোমাদের কোনই উপকারে আসবে না, নিঃসন্দেহে আল্লাহ মুমিনদের সাথে রয়েছেন।' (সুরা আনফাল ১৯)

যুদ্ধ শুরু:

যুদ্ধের সুচনা হয় এভাবে যে, মাখযুম গোত্রের আসওয়াদ জলাধারের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে এবং বলতে থাকে, আল্লাহর কসম! আমি হয় তো তাদের ওখান থেকে পানি নিয়ে আসবো না হয় তা ধ্বংস করবো। অন্যথায় এর জন্য নিজের জান দিব। সে এগিয়ে আসতেই হামযা রাযি. তাকে আক্রমণ করলেন এবং হত্যা করলেন। তখন ওতবা সামনে এগিয়ে এসে দন্দ যুদ্ধের প্রস্তাব করল। ওতবার দুপাশে দাঁড়ালো তার ভ্রাতা সায়বা এবং পুত্র ওয়ালিদ। মুসলমানদের পক্ষে এগিয়ে এলেন আউফ ইবনে হারেছ, মুআইদ ইবনে হারেছ এবং আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা রাযি.। ওতবা তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করে জানল যে তারা আনসার। ওতবা তখন বলল, তোমাদের উপর অসি চালনা করে হাত কলুষিত করতে চাইনা। তোমরা আমাদের সমকক্ষ নও। তখন সে রাসূল সা. এর উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলল, 'মুহাম্মদ! যুদ্ধের সাধ থাকলে আমাদের সমকক্ষ কুরাইশদের পাঠাও। রাসূল সা. আনসারগণকে সরে যেতে বললেন এবং উবায়দা, হামযা, এবং আলী রাযি. কে সামনে ডেকে আনলেন। ওতবার সম্মুখে হামযা রাযি. দাঁড়ালেন ওলিদের সম্মুখে আলী রাযি. এবং সায়বার সম্মুখে উবায়দা রাযি.। যুদ্ধ শুরু হল। চোখের পলকে হামযার আঘাতে ওতবা নিহত হল আলীর আঘাতে ওলিদের দেহ দ্বিখণ্ডিত হল; কিন্তু উবায়দা রাযি. ও সায়বার মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হল। তারা উভয়েই উভয়কে আঘাত করল।

অতঃপর হামযা এবং আলী রাযি. এসে একসঙ্গে আঘাত করে সায়বাকে দ্বিখন্ডিত করলেন এবং উবায়দাকে স্কন্ধে তুলে রাসূল সা. এর নিকটে নিয়ে গেলেন। উবায়দা রাযি. এর পা কেটে গিয়েছিল। তিনি আহত অবস্থায় থেকে চার অথবা পাঁচ দিন পর মদীনায় ফেরার পথে শহীদ হন।

এরপর শুরু হল সর্বাত্মক যুদ্ধ এবং ক্রমশ তা ঘোরতর রূপ ধারণ করতে লাগল। অস্ত্রশস্ত্রে পূর্ণ সজ্জিত এক হাজার যোদ্ধার মোকাবেলায় প্রায় নিরস্ত্র তিনশত তের জন মুজাহিদ। যেন হাজার নেকড়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ক্ষুদ্র মেষপালের উপর কিংবা প্রবল ঝড় নিভিয়ে

দিতে চাইছে ছোট্ট প্রদীপ। কিন্তু মুমিনগণ আল্লাহর উপর ভরসা করে দৃঢ়ভাবে কুরাইদের আক্রমণ প্রতিহত করতে থাকেন এবং পাল্টা আক্রমণ করে করে শত্রু বাহিনীকে একেবারে বিপর্যস্ত করে তুললেন।

দুই ভাইয়ের বীরত্ব

মদীনা বাসীরা সকলেই জানতেন যে, আবু জাহেল হচ্ছে ইসলামের সর্বাপেক্ষা বড় শত্রু। সে প্রিয় নবীজিকে অনেক কষ্ট দিয়েছে। সে নরাধম এবং পাপিষ্ট। তার জন্যেই এই যুদ্ধের সূত্রপাত। আনস-ারদের মধ্য থেকে মুওয়াজ ও মুআওয়াজ নামক অল্প বয়সী দুই ভাই প্রতিজ্ঞা করলেন যে, এ দুর্বৃত্তকে যেভাবেই হোক তারা হত্যা করবে। না হলে প্রাণ দেবে। আব্দুর রহমান ইবনে আউফ যুদ্ধের ময়দানে যেখানে ছিলেন সেখানে এই দুই ভাই এসে আবু জাহেলের সংবাদ জানতে চাইলেন। তিনি দুজনকে অদূরে অবস্থানরত আবু জাহেলের প্রতি ইশারা করে দেখিয়ে দিলেন। এরা দুজন তখন বাজপাখীর মত প্রাণপণে আবু জাহেলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তাকে ধরাশয়ী করল। আবু জাহেলের পুত্র ইকরামা পিছন থেকে এসে মুআওয়াজের বাম বাহুতে এমনভাবে তরবারী দিয়ে আঘাত করল যে তাঁর বাহুটি কেটে গেল। কিন্তু পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হল না। মুআওয়াজ ঝুলন্ত হাতটা পায়ের নিচে রেখে টেনে ছিঁড়ে ফেললেন এবং এক হাত নিয়েই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলেন। এরপর আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ আবু জাহেলের মাথা কেটে তাকে হত্যা করলেন।

ওতবা ও আবু জাহেলের মৃত্যুতে কুরাইশ বাহিনী সম্পূর্ণরুপে ভেঙ্গে পড়ল এবং নিরুৎসাহিত হল । তারা আর যুদ্ধ করতে সাহস পেল না। এই যুদ্ধে মহান আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে সরাসরি ফেরেশতাদের মাধ্যমে সাহায্য করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ

স্বরণ কর সেই সংকটময় মুহূর্তের কথা, যখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সাহায্যের আবেদন করেছিলে, আর তিনি সেই আবেদন কবুল করেছিলেন, (আর তিনি বলেছিলেন) আমি তোমাদেরকে হাজার ফেরেশ্তা দ্বারা সাহায্য করবো, যারা ধারাবাহিকভাবে আসবে। (সূরা আনফাল ৯)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ

(ঐ সময়ের কথা স্বরণ কর) 'যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশত-াদের নির্দেশ করলেন, আমি তোমাদের সাথে আছি , সুতরাং তোমরা ঈমানদারদের সঙ্গে থেকে শক্তি বৃদ্ধি করে তাদের সুপ্রতিষ্ঠিত ও অবিচল রাখো, আর আমি কাফেরদের হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার করে দেব, অতএব তোমরা তাদের ঘাড়ে আঘাত হানো, আর আঘাত হানো তাদের অঙ্গুলিসমূহের জোড়ায় জোড়ায়। (সুরা আনফাল ১২)

যুদ্ধের এক পর্যায়ে রাসূল সা. এক মুঠো কংকর নিয়ে শত্রুদের দিকে ছুঁড়ে দিলেন। এই কংকর আল্লাহর আদেশে কুরাইশদের চোখ ভরে গেল। এবং ব্যাকুল বিব্রতকর অবস্থায় কুরাইশরা তখন পলায়ন করল। কুরাইশদের পলায়নের সময় রাসূল সা. আক্রমণ করার নির্দেশ দিলেন।

এ বিষয়ে পরে ওহী নাযিল হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

'তোমরা তাদের হত্যা করনি, বরং আল্লাহই তাদেরকে হত্যা করেছেন, আর (হে নবী সা.) যখন তুমি (ধুলোবালি) নিক্ষেপ করেছিলে তখন তা মূলতঃ তুমি নিক্ষেপ করনি; বরং আল্লাহই তা নিক্ষেপ করেছিলেন, এবং এটা করা হয়েছিল মু'মিনদেরকে তাঁর পক্ষ থেকে তাদের কষ্টের উত্তম পুরস্কার দান করার জন্যে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ সব কিছু শোনেন ও সব কিছু জানেন। (সুরা আনফাল ১৭)

এই যুদ্ধে মহান আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের বিজয় দান করলেন এবং হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য করে দিলেন। বদরের যুদ্ধে কুরাইশদের প্রায় সকল নেতৃবৃন্দ নিহত হয়েছিল। এদের মধ্যে ওতবা, সায়বা, আবু জাহেল, উমাইয়া ইবনে খালফ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ছিল। এই যুদ্ধে কুরাইশদের মোট ৭০ জন নিহত হয় এবং অনুরূপ সংখ্যক বন্দী হয়। অন্য দিকে মুসলমানদের মাত্র ১৪ জন শহীদ হন।

যুদ্ধবন্দীদের মদীনায় নিয়ে আসা হলে রাসূল সা. প্রথমে তাদের ব্যাপারে পারামর্শ চাইলেন যে এদের ব্যাপারে কী করা যায়। হযরত আবু বকর রাযি. বিনীত নিবেদন করলেন, 'এরা সবাই আমাদের আপনাপন গোত্রের লোক। সবাই আত্মীয়-স্বজন। সুতরাং মুক্তিপণের বিনিময়ে এদের ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে।' কিন্তু ওমর রাযি. বললেন, 'এরা সবাই ইসলামের শত্রু। সুতরাং এদের ব্যাপারে আত্মীয়-অনাত্মীয় ভেদাভেদের কোন সুযোগ নেই। এদের সবাইকে হত্যা করা উচিত। আমরা প্রত্যেকেই নিজনিজ হাতে নিকটতম আত্মীয়দেরকে কতল করবো। কিন্তু রাসূল সা. আবু বকর রাযি. এর মতামতকে প্রাধান্য দিলেন এবং মুক্তিপণের বিনিময়ে বন্দীদের মুক্তি দেবেন বলে ঘোষনা করলেন। যুদ্ধবন্দীদেরকে সাহাবীদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয় এবং তাদের যাতে কোন কষ্ট না হয় সে দিকে লক্ষ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। সাহবীগণ রাসূল সা. এর নির্দেশে বন্দীদের প্রতি খুবই উদার ব্যবহার করেন। তারা নিজেরা খেজুর খেয়ে দিন কাটিয়ে দেন। অথচ বন্দীদের জন্য নিয়মিত আহার্যের ব্যবস্থা করেছেন। সে যুগে বন্দীদের প্রতি সদ্ব্যবহারের কোন নিয়ম ছিল না বরং দুর্ব্যবহার এবং হত্যাই ছিল বন্দীদের প্রাপ্য। কিন্তু সেই সময়ে রাসূলে খোদা সা. বন্দীদের প্রতি সদাচরণের যে নীতি নির্মাণ করলেন তাঁর উদারতা এবং মানুষের প্রতি মানবিক আচরণ একটি নতুন জীবনবোধের জন্ম দিল।

اللهم صل وسلم علي نبينا محمد وعلي آل محمد

বিয়ের বয়স নিয়ে উল্টো চিন্তা...

বিয়ের বয়স কত হবে এটা নিয়ে ভাবনাগুলো যেন এক রকম। মানে বলা হয়,

'বিয়ের পর সন্তান হলে কী হবে', 'কম বয়সে সন্তানধারণ ভালো না মন্দ হবে' ইত্যাদি। না আমি ঐ দিকে যাবো না, উল্টোভাবে চিন্তা করবো।

ধরুন, একজন পুরুষ বিয়ে করলো ২০ বছর বয়সে, সে বাবা হলো ২২ বছর বয়সে।

আরেকজন পুরুষ বিয়ে করলো ৩৫ বছর বয়সে, সে বাবা হলো ৩৭ বছর বয়সে।

প্রথম পুরুষ যখন বৃদ্ধ হলো মানে বয়স ৬০ হলো, তখন তার বড় সন্তানের বয়স ৩৮ ।

দ্বিতীয় পুরুষ যখন বৃদ্ধ হলো, মানে বয়স ৬০ হলো, তখন তার বড় সন্তানের বয়স মাত্র ২৩ (ছেলেও হতে পারে, মেয়েও হতে পারে) ।

প্রথম পুরুষকে তার বড় সন্তান মোটামুটি কর্মক্ষম অবস্থায় পাবে ৩৮ বছর ।

দ্বিতীয় পুরুষকে তার বড় সন্তান (ছোটরা আরো কম পাবে) মোটামুটি কর্মক্ষম অবস্থায় পাবে ২৩ বছর (অনেক সময় এর মধ্যেও বাবা মারা যায়)।

অর্থাৎ কম বয়সে বিয়ে করলে-

১. একজন সন্তান তার পিতা/মাতাকে সুস্থ/জীবিত অবস্থায় অনেক দিন পায়।
২. বৃদ্ধ বয়সে সন্তানদের বয়স মোটামুটি বেশি থাকে, ফলে বৃদ্ধ বাবা/মার সামাজিক নিরাপত্তা থাকে।
৩. পিতা/মাতা ৫৫-৬০ বছর বয়সে হঠাৎ মারা গেলে সন্তানদের অবস্থা একেবারে সঙ্গীন হয় না।

অপরপক্ষে অধিক বয়সে বিয়ে করলে-

১. একজন সন্তান তার পিতা/মাতাকে সুস্থ/জীবিত অবস্থায় খুব কম সময় পায়।
২. বৃদ্ধ বয়সে সন্তানদের বয়সও কম থাকে, ফলে বৃদ্ধ পিতা-মাতার সামাজিক নিরাপত্তা সঙ্কটাপন্ন হয়।
৩. পিতা/মাতা ৫৫-৬০ বছর বয়সে হঠাৎ মারা গেলে সন্তানদের অবস্থা একেবারে সঙ্গীন হয়ে ওঠে। অনেকের পড়ালেখা শেষ হওয়ার আগেই বাবা মারা গেলে অবস্থা বেগতিক হয়।
৪. অনেক বৃদ্ধ লোকের বয়স হয়ে যায়, কিন্তু সন্তান ছোট দেখে খুব কষ্ট করেও চাকরি চালিয়ে যেতে হয়, যা অত্যন্ত অমানবিক।

আমি আবারও বলছি, সমাজ হচ্ছে একটি চক্র বা সাইকেলের মত। এর একটি অংশ যদি বাধাপ্রাপ্ত হয়, তবে পুরো সিস্টেমটা নষ্ট হয়ে যায়। যারা আজকে অধিক বয়সে বিয়ে করার জন্য প্রচারণা চালাচ্ছে, তারা আসলে চাইছে সমাজের সেই সাইকেলটা ভেঙে দিতে, এতে আলটিমেট ক্ষতিগ্রস্ত হবে অনেকগুলো দিক; সন্তান বঞ্চিত হবে পিতা-মাতার স্নেহ থেকে, বৃদ্ধ বাবা-মা পাবে না সামাজিক নিরাপত্তা।

বর্তমান সমাজে অহরহ পরকিয়া, ডিভোর্স, দাম্পত্য জীবনে অশান্তির মূল কারণ

বর্তমান সমাজে অহরহ পরকিয়া, ডিভোর্স, দাম্পত্য জীবনে অশান্তির মূল কারণ পরিবারের মধ্যে ইসলাম না থাকা। আর যে পরিবারে ইসলাম থাকবে না সে পরিবারে থাকবে না আল্লাহভীতি এবং নিজ কর্মের জবাবদিহিতা। এতে করে শয়তানের পরিকল্পনা অনুযায়ী যাচ্ছেতাই করে যাওয়া যায়। যার দরুন ঘরে বৌ থাকা সত্ত্বেও পর-নারীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কিছু পুরুষের জন্য মামুলি ব্যাপার। এভাবে একটা পর্যায়ে ঐ পুরুষরা নিজ বৌয়ের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে এবং পরকিয়ায় জড়িয়ে যায়। এরপর পারিবারিক অশান্তি, এমনকি ডিভোর্সের মত ঘটনাও ঘটে। আর এটা ঘটে ঐ পুরুষগুলোর মধ্যে আল্লাহ ভীতি না থাকার কারণে। আল্লাহভীতি তো সেটাই যা স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর আল্লাহর জন্য নিজেদের চোখ ও অন্তরকে হেফাজত করে এবং আল্লাহর জন্য একে অপরকে গভীরভাবে ভালোবাসে। যে ভালোবাসা বিয়ের দিন যেমন থাকে, বিয়ের ৩০ বছর পরেও একই রকম থাকে। আর এটা হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্য রহমত। তারা আল্লাহর জন্য নিজেদের চরিত্র হেফাজত করেছেন বলে আল্লাহ তাদের দুজনের মধ্যে এমন গভীর ভালোবাসা স্থাপন করে দিয়েছেন। ইসলামের বিপরীত স্রোতের মানুষগুলোর জন্য যা শুধু কল্পনা ! আমাদের সমাজে তথাকথিত মা-বাবারা তাদের সন্তানদের বিয়ে দেয়ার সময় তাকওয়া দেখে বিয়ে দিতে চায় না। তারা দেখে ছেলে কত টাকার মালিক, ফ্যামিলি স্ট্যাটাস কেমন, কত গুলো ডিগ্রী আছে ছেলের বাস্কেটে। অথচ, একবারের জন্য ভাবতে চায় না, যে ছেলের কাছে সারা জীবনের জন্য তার মেয়েকে দিচ্ছে, সে ছেলের চরিত্র ঠিক কিনা বা ছেলেটির ব্যক্তিগত জীবনে আল্লাহভীরুতা আছে কিনা! একইভাবে দেখা যায় ছেলেদের ক্ষেত্রে। সুন্দরী বৌয়ের খোঁজে তারা তাকওয়াবান স্ত্রীর কথা ভুলে যায়। একসময় দেখা যায়, সেই সুন্দরী বৌ তাকে ফেলে চলে যায় বা পরকিয়ায় আক্রান্ত হয়, বা তার নিজের রুপের অহংকারে সংসারে সবসময় অশান্তি লেগেই থাকে। অথচ, রাসূল সা. বলেছেন, দুনিয়ার যত সম্পদ আছে, তার মধ্যে উত্তম সম্পদ হচ্ছে একজন নেককার স্ত্রী। আমাদের মা-বাবাদের উচিত তাদের কন্যাদের সু-পাত্রস্থ করতে চাইলে দীনদার, পরহেজগার, তাকওয়াবান যুবকদের সাথে বিয়ে দেয়া। এতে করে কন্যাও সুখী হবে এবং সমাজেও পরকিয়া, ডিভোর্সের মত ঘটনা অনেকাংশে কমে যাবে। এই ব্যাপারে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশনা হল :- 'যার দীনদারী ও আখলাক-চরিত্রে তোমরা সন্তুষ্ট, এমন কেউ প্রস্তাব দিলে তার সাথে তোমরা বিবাহ সম্পন্ন কর। তা না করলে পৃথিবীতে ফিৎনা দেখা দেবে ও ব্যাপক ফ্যাসাদ ছড়িয়ে পড়বে।' (তিরমিযী, হাদীস: ১০৮৪) আল্লাহ আমাদের বুঝার তৌফিক দান করুন। আমীন।

পর্দার প্রতি আমার ভালোবাসা কিভাবে জন্মাল

-ইউভন রেডলি

তালেবানদের হাতে ধরা পড়ার আগ পর্যন্ত আমার কাছে পর্দানশীল নারীদের সাধাসিদে ও পুরুষদের দ্বারা নিপীড়িত 'প্রাণী' মনে হত। ২০০১ সালের সেপ্টেম্বরে, যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলার মাত্র ১৫ দিন পরেই আমি আফগানিস্তানে গোপনে ঢুকে পড়ি পুরুষ শাসিত এই সমাজে নারীর অবস্থান এবং জীবনযাত্রা আবিষ্কার করতে। আফগানিস্তানে আমি আপাদমস্তক একটি কালো বোরখা পরে থাকতাম, তবুও তালেবানরা কিভাবে যেন আমার আসল পরিচয় বুঝতে পেরে আমাকে ধরে নিয়ে দশদিন আটকে রাখল। আটক থাকা অবস্থায় তাদের আমি যথেষ্ট পরিমাণে গালাগালি করেছি এবং বাক-বিতণ্ডায় জড়িয়েছি। অবশেষে তারা আমাকে একটা 'খারাপ' মহিলা হিসাবে অভিহিত করলেও আমাকে মুক্ত করে দেয়। শর্ত ছিল একটাই- কুরআন পড়তে হবে এবং ইসলাম সম্পর্কে জানার চেষ্টা করতে হবে। (সত্যি বলতে আমি নিশ্চিত না যে, আমার মুক্তিতে কারা বেশি খুশি! ওরা নাকি আমি!)

লন্ডনে ফিরে আসার পরে আমি আমার কথা রাখলাম- কুরআন পড়া শুরু করে দিলাম। কুরআন পড়ে আমি যা আবিস্কার করলাম তাতে বিস্মিত হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় আমার ছিল না। আমি ধারণা করতাম যে, কুরআনের অধ্যায়গুলোতে নারীদের নির্যাতন এবং কন্যা সন্তানদের ওপর নিপীড়ন করার নির্দেশনা দেয়া থাকবে। এর কিছুইতো ছিলনা; বরং আমি আবিস্কার করলাম যে, এই গ্রন্থে নারীদের মুক্তির ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। তালেবানদের হাতে ধরা পড়ার দুই বছর পরে আমি ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করি। এতে করে আমার বন্ধু এবং আত্মীয়দের মধ্যে বিস্ময় এবং হতাশার একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখতে পেলাম। কেউ কেউ অবশ্য সাহসও যুগিয়েছিল।

এরপর ব্রিটেনের পূর্ববর্তী ফরেইন সেক্রেটারি যখন নিকাবকে এক টুকরা কাপড় যা পড়লে শুধু চোখ দেখা যায় এবং বিভিন্ন জাতির একসাথে থাকার ক্ষেত্রে একটা প্রতিবন্ধকতা' হিসাবে বিশ্লেষণ করলেন তখন লোকটার প্রতি বেশ অশ্রদ্ধা জন্মেছিল। তবে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপার ছিল যে, প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার, লেখক সালমান রুশদি এবং ইতালির প্রধানমন্ত্রী রোমানো প্রদিও এই বক্তব্যকে সমর্থন করেছিলেন।

হিজাবের ভিতরে ও বাইরে দুই দিক থেকেই পৃথিবীকে দেখার সৌভাগ্য এবং অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। সেই অভিজ্ঞতা থেকে আমি যতটুকু বলতে পারি তা হল- যেসব পশ্চিমা রাজনীতিবিদরা পুরুষ শাসিত ইসলামিক সমাজ নিয়ে মন্তব্য করেন তাদের ইসলাম সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। তারা পর্দা, বাল্য বিবাহ, নারীদের খৎনা, পরিবারের মান-সম্মান রক্ষার্থে নারী হত্যা, জোরপূর্বক বিয়ের ব্যাপারে ভুলভাবে ইসলামকে দোষারোপ করেন। আমার মনে হয় জ্ঞানহীনতার কারণেই তাদের দাম্ভিকতা এতদূর গিয়েছে। এগুলো শুধুই সাংস্কৃতিক প্রথা এবং এর সাথে ইসলামের কোন সম্পর্কই নেই। কুরআন খুব যত্ন সহকারে পড়লে দেখা যাবে যে

পশ্চিমা নারীবাদীরা ১৭০০ সালে যে সকল অধিকারের জন্য আন্দোলন করেছিল, মুসলিম নারীদের সেসব অধিকার ১৪০০ বছর আগেই দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইসলামে আধ্যাত্মিকতা, শিক্ষা-দীক্ষার, গুরুত্ব এবং যোগ্যতার দিক দিয়ে নারী আর পুরুষকে সমান পাল্লায় রাখা হয়েছে। সন্তান জন্ম দেওয়া এবং বড় করে তোলাকে ইসলামে নারীর একটি সন্দেহাতীত গুণ হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে।

ইসলাম যখন একটা নারীকে এতকিছু দেয় তখন শুধু শুধু কেন পশ্চিমা পুরুষরা ইসলামে নারীদের পোশাক নিয়ে কথা তোলে? নিকাবকে অবজ্ঞা করে বক্তব্য শুধু সরকারের মুখপাত্রদের কাছ থেকেই আসেনি, এসেছে অন্যান্য মন্ত্রীদের কাছ থেকেও। গরডন ব্রাউন (পরবর্তীতে যিনি ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন) এবং জন রেইডও নিকাব নিয়ে বাজে মন্তব্য করেছেন এবং তাদের বক্তব্যকে স্কটল্যান্ডের মুখপাত্ররা প্রীতি সম্ভাষণও জানিয়েছেন।

ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়া এবং মাথায় স্কার্ফ পরার ফলাফল আমার জন্য ছিল সাংঘাতিক! আমি শুধু আমার চুলগুলোই ঢেকেছিলাম- এই চুল ঢাকার ফলে সাথে সাথেই আমি ব্রিটেনের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হয়ে গেলাম। আমি জানতাম যে ইসলাম বিরোধীদের কাছ থেকে দুয়েকটা কটু কথা আমার শুনতে হবে, কিন্তু রাস্তা ঘাটে অপরিচিত লোকদের কাছ থেকে যে ধরনের বিরোধিতা আমি পেয়েছি তা আমার জন্মভূমিতে আমার জন্য ছিল নিতান্তই দুঃখজনক। চাকরী শেষে বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে গেলে হাত নেড়ে অনেক ক্যাব ডেকেছি কিন্তু কেউই থামেনি। অথচ তাদের “For Hire” লাইটটি জ্বলজ্বল করত। একদিন এক ক্যাব ড্রাইভার আমার সামনেই একজন যাত্রীকে নামিয়ে দিল, আমি তার জানালায় নক করলাম কথা বলার জন্য। সে আমার দিকে একটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে চলে গেল, আমার সাথে কথা বলারও প্রয়োজনবোধ করল না। ভদ্রতার শীর্ষে থাকা ব্রিটিশ জাতির কাছ থেকে এ ধরনের ব্যবহার কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য না। আরেকদিন আরেকজন তো বলেই বসলো যে, ‘আমার গাড়ীতে দয়া করে কোন বোমা রেখে যাবেন না’ সেই ড্রাইভার আমাকে এটাও জিজ্ঞেস করেছিল ‘ওসামা কোথায় লুকিয়ে আছে?’

শালীনভাবে পোশাক পরা একজন মুসলিমার দায়িত্ব বটে। তবে আমার চেনা-জানা বেশিরভাগ মুসলিমা হিজাব পরতে ‘পছন্দ’ করে, যা মুখমণ্ডলকে অনাবৃত অবস্থায় রেখে দেয়। কিছুসংখ্যক আবার নিকাব পরতেই পছন্দ করে। একটি ব্যক্তিগত উক্তি আমি পড়েছিলাম, তা হল, ‘আমার পোশাক যদি নির্দেশ করে যে আমি একজন মুসলিম তাহলে আপনার উচিৎ আমাকে আমার প্রাপ্য সম্মান দেওয়া।’ ওয়াল স্ট্রীটের একজন ব্যাংকারের পোশাক যেমন বলে দেয় যে পোশাক পরিহিত ব্যক্তি একজন গুরুত্বপূর্ণ লোক তেমনি আমিও মনে করি মানুষ হিসাবে সম্মান প্রাপ্তির অধিকার সেই ব্যাংকারের চেয়ে আমার কোন অংশে কম না। আমার মতন যারা সদ্য ধর্মান্তরিত, তাদের কাছে অন্যদের আড়চোখের দৃষ্টি কেমন লাগে সেটা শুধু তারাই জানে।

ইসলাম আমার সম্মান নিশ্চিত করেছে। ইসলাম বলে যে, আমার শিক্ষাগ্রহণ করার অধিকার রয়েছে। ইসলাম এটাও বলে যে জ্ঞান অর্জন করা আমার কর্তব্য। ইসলামের কাঠামোর কোন জায়গাতেই বলা নেই যে একজন মহিলার ধোয়া-মোছা, রান্না-বান্নার কাজ করতে হবে। স্ত্রীর উপর নির্যাতনের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। নিন্দুকদের দেখবেন এলোমেলোভাবে কুরআনের আয়াত

উল্লেখ করে ইসলামকে অপমান করতে চাচ্ছে। কিন্তু তারা ঐ অনুচ্ছেদের প্রসঙ্গ ছাড়াই আয়াতগুলো বিচ্ছিন্নভাবে তুলে ধরে। একজন পুরুষ যদি তার স্ত্রীর দেহে হাত তোলেও, কিন্তু সেই আঘাতের যেন ব্যথা না হয় তাও বলা আছে মেরো না' কথাটা কুরআন এভাবেই বলেছে।

আপনারা যদি বলেন যে, মুসলিম পুরুষদের নারীদের প্রতি আচরণের রীতি-নীতিগুলো আরেকবার খতিয়ে দেখা উচিৎ তাহলে আমি বলব- শুধু মুসলিম না, সুসভ্য আমেরিকানদেরও নারীদের প্রতি আচরণের ব্যাপারে একটু চিন্তা করা উচিৎ। জাতীয় গৃহ নির্যাতন হটলাইনের (National Domestic Violence Hotline) জরিপে দেখা গেছে যে, গড়ে সম্পর্ক শুরু হবার ১২ মাসের মধ্যে অ্যামেরিকান মহিলারা তাদের পুরুষ সঙ্গীদের দ্বারা মারাত্মক নির্যাতনের শিকার হন। গড়ে প্রতিদিন তিনজনেরও বেশি মহিলা তাদের বয়ফ্রেণ্ড/স্বামীর নির্যাতনে মারা যান। ৯/১১ হামলার দিন থেকে হিসাব করলে বয়ফ্রেণ্ড/ স্বামীর নির্যাতনে মারা যাওয়া নারীর সংখ্যা হবে ৫,৫০০।

উগ্র পুরুষরা যে শুধু মুসলিমই হবে এমন কোন কথা নেই। হটলাইন জরিপে দেখা যায় যে, পৃথিবীতে প্রতি তিনজন মহিলার ভেতরে একজন তার পুরুষসঙ্গীর হাতে মার খেয়েছে, যৌনসহবাস করতে বাধ্য হয়েছে অথবা, অন্যকোনভাবে অপব্যাবহারিত হয়েছে। এখান থেকেই দেখা যায় যে, নারী নির্যাতন একটি বৈশ্বিক সমস্যা। এই সমস্যা কোন ধর্ম, গোত্র, জাতি অথবা সংস্কৃতির ভেতর সীমাবদ্ধ নয়।

এটাও সত্যি যে, পশ্চিমা মহিলারা যতই বিদ্রোহ করুক না কেন, পশ্চিমা পুরুষরা এখনো নিজেদেরকে মহিলাদের চেয়ে উচ্চতর পর্যায়ের সৃষ্টি মনে করে। কামলা খাটার ক্ষেত্রে অথবা বড় বড় মিটিং এর ক্ষেত্রে- যেখানেই মহিলা থাকুক না কেন তাদেরকে সবসময়ই পুরুষদের থেকে কম টাকা দেওয়া হয় এবং মিডিয়াতে মহিলাদের একধরণের পণ্যদ্রব্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

যারা এখনও দাবি করতে চাচ্ছেন যে, ইসলাম আসলেই মহিলাদের ওপর নিপীড়নকারী একটা ধর্ম তারা দয়া করে ১৯৯২ সালে দেওয়া প্যাট রবার্টসনের একটা বক্তব্য মনে করে দেখুন! এই বক্তব্যে তিনি নারীবাদকে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন এভাবে, 'নারীবাদ হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক এবং পরিবার-বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলন যা মহিলাদের স্বামীকে তালাক দেওয়া, সন্তান হত্যা, পুঁজিবাদ ধ্বংস করা এবং সমকামী হতে শেখায়'

এখন আপনারাই আমাকে বলুন! কারা বেশি সভ্য ও প্রগতিশীল ?

-ইউভন রেডলি, ইসলামি চ্যানেল টিভি, লন্ডনের একজন রাজনৈতিক সম্পাদক এবং "In The Hands of the Taliban: Her Extraordinary Stor" এর সহ লেখিকা। মূল লেখা ২২শে অক্টোবর ২০০৬ সালে দ্য ওয়াশিংটন পোস্টে প্রকাশিত হয়েছিল -http://www.washington-post.com/wp-

কেউ কেউ বলেন, নফসের জিহাদ বড় জিহাদ। এ বিষয়ে তারা একটি হাদীসও বর্ণনা করে থাকেন। একদল লোক জিহাদ থেকে ফিরে আসলে নাকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন,

قدمتم خير مقدم قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر مجاهدة العبد هواه

‘তোমরা খুব উত্তম স্থানেই ফিরে এসেছো। তোমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের দিকে ফিরে এসেছো। আর তা হলো অন্তরের সাথে জিহাদ করা। -দাইলামী, কানযুল উম্মাল, জামউল জাওয়ামি

এই হাদীসের কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে,

رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر

‘আমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের দিকে ফিরে এসেছি।’
ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এই হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন,

فَلَا أَصْلَ لَهُ وَلَمْ يَرْوِهِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِأَقْوَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْعَالِهِ وَجِهَادُ الْكُفَّارِ مِنْ أَعْظَمِ الْأَعْمَالِ ؛ بَلْ هُوَ أَفْضَلُ مَا تَطَوَّعَ بِهِ الْإِنْسَانُ

‘এই হাদীসটির কোনো ভিত্তি নেই। আল্লাহর রাসূলের কথা ও কাজ সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন এমন কেউই এটি সর্বোত্তম বর্ণনা করেন নি। আর কাফিরদের সাথে জিহাদ করা সর্বোত্তম আমলসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। বরং এটি আল্লাহর ইবাদতসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। -মাজমুউল ফাতাওয়া
তবে সহীহ হাদীসে আছে-

المجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ

‘মুজাহিদ সেই যে তাঁর নফসের সাথে জিহাদ করে।’ **-সুনান তিরমিযি**
অন্য রেওয়ায়েতে এসেছে,

وأفضل الجهاد من جاهد نفسه في ذات الله عز وجل

‘সর্বোত্তম জিহাদ হলো আল্লাহর বিধানের ব্যাপারে অন্তরের সাথে জিহাদ করা।’ -জামউল জাওয়ামি, কানযুল উম্মাল
এই সহীহ হাদীস দুটির সাথে উল্লিখিত হাদীস দুটির পার্থক্য হলো- এখানে সরাসরি অন্তরের জিহাদকে কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদের তুলনায় বড় জিহাদ হিসাবে উল্লেখ করা হয়নি। শুধু বলা হয়েছে- অন্তরের জিহাদ সর্বত্তোম জিহাদ।
এখন প্রশ্ন হলো, অন্তরের জিহাদ বলতে আমরা কী বুঝবো? আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মন যা অপছন্দ করে মনের অপছন্দ সত্ত্বেও সেটা আদায় করাই কি অন্তরের জিহাদ নয়? যদি তাই হয় তবে আল্লাহ নিজে সাক্ষ্য দিয়ে বলেন,

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ

‘তোমাদের উপর কিতাল ফরজ করা হয়েছে যদিও তা তোমাদের নিকট অপছন্দনীয়।’ -সূরা বাকারা: ২১৬
অন্য কোনো আমলের ব্যাপারে আল্লাহ একথা বলেননি। সুতরাং যত উত্তম কাজ আছে তার মধ্যে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা মানুষের নিকট সর্বাপেক্ষা বেশি অপছন্দনীয়; তাই যারা শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করছেন তারাই অন্তরের সাথে সর্বাপেক্ষা বেশি জিহাদ করছেন।

আপনার জিজ্ঞাসা

আমাদের জবাব

উত্তরঃ
জিহাদ দুই প্রকার- ১. আক্রমণাত্মক জিহাদ ২. প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ। নিঃসন্দেহে ইসলাম প্রচার এবং দলেদলে মানুষ ইসলামে প্রবেশের ক্ষেত্রে আক্রমণাত্মক জিহাদের বড় প্রভাব রয়েছে। কেননা আক্রমণাত্মক জিহাদই মানুষের ঐ সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করে যা মানুষকে ইসলামের সৌন্দর্য অবলোকন করতে এবং ইসলাম নিয়ে ভাবতে বাধা প্রদান করে। আর ইসলামের শত্রুদের অন্তর সর্বদাই আক্রমণাত্মক জিহাদের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে।

একটি ইংরেজী ইসলামিক প্রত্রিকার এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, একটি ভয় সর্বদাই পশ্চিমাবিশ্বকে তাড়িয়ে বেড়ায়। তা হল, ইসলাম শুধুমাত্র একটি ধর্মের নাম নয়; বরং এর একটি গুরুত্বপূর্ণ রোকন হচ্ছে জিহাদ। এই জিহাদের কারণেই ইসলাম দিনদিন বিস্তার লাভ করছে। রবার্ট বেন বলেন, ইসলাম পূর্বে একবার সারা দুনিয়ার সাথে যুদ্ধ করেছে এবং দ্বিতীয় বার আবারও সারা দুনিয়ার সাথে যুদ্ধ করবে। একদিকে প্রাচ্যবিদদের কেউ কেউ ইসলামের প্রতি অপবাদের সুরে বলে, 'আরে ইসলাম তো তরবারীর জোরে প্রসারিত হয়েছে।'

অন্য দিকে টমাস আর্নোলড একজন প্রাচ্যবিদ। তিনি মুসলমানদের অন্তর থেকে জিহাদী প্রেরণা শক্তিকে বিলুপ্ত করার জন্য 'আদ দাওয়াত ইলাল ইসলাম' এই বইটি লিখেন। এই বইয়ে ইসলামের প্রতি তার নিজস্ব মনগড়া একটি দাবি পেশ করে বলেন, 'ইসলাম হল শান্তির ধর্ম। সুতরাং ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে তরবারীর কোন ভূমিকা নেই। বরং ইসলাম তো প্রসারিত হয়েছে শান্তিপূর্ণ দাওয়াতের মাধ্যমে'। এদিকে মুসলমানরাও তাদের পাতানো ফাঁদে ফেঁসে গেছে। সুতরাং তারা যখন প্রাচ্যবিদদের বলতে শোনে, ইসলাম তো তরবারীর মাধ্যমে প্রচার হয়েছে। তখন তারা বলে, তোমাদের এধরণের দাবি ঠিক না। এ দাবি মিথ্যা। কারণ তোমাদের দাবি তোমাদের কথা দ্বারাই মিথ্যা প্রমাণিত হয়। তোমরা কি দেখছো না টমাস কী বলে? সে তো এমন এমন বলে।

পরাজয়ের মানসিকতাসম্পন্ন কিছু লোকের আত্মপ্রকাশ ঘটল যারা ইসলামকে সব ধরণের অপবাদ থেকে দূরে রাখতে চায়। সুতরাং তারা ইসলামকে এ অপবাদটি থেকেও মুক্ত করতে চাইল। তাই তারা ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে তরবারীর ভূমিকাকে একেবারে অস্বীকার করে বসল। এবং তারা বলতে লাগল, 'ইসলামে আক্রমণাত্মক জিহাদ বলতে কিছু নেই; বরং ইসলাম শুধুমাত্র প্রতিরক্ষামূলক জিহাদের অনুমতি দেয়। আসলে ইসলামে এ ধরনের হাস্যকর, মনগড়া, ভ্রান্ত কথার কোন ভিত্তি নেই। তাদের এধরনের কথা কুরআনের খেলাফ হাদিসের খেলাফ। সালফে সালেহীনদের ইজমার খেলাফ এবং কিয়াসের খেলাফ। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, দীন একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্যই। তাই আল্লাহর কালিমাই উঁচু থাকবে।' আর কালিমা শব্দটি আম (তথা ব্যাপক) এর মাধ্যমে পুরো কুরআনই উদ্দেশ্য। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

'আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছি এবং তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে।' (সুরা হাদীদ: আয়াত-২৫)

সুতরাং রাসূলগণের প্রেরণ এবং কিতাব নাজিলের উদ্দেশ্য হল- যাতে করে মানুষ হুকুকুল্লাহ এবং হুকুকুল ইবাদগুলো ইনসাফের সাথে আদায় করে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

'আর আমি নাজিল করেছি লৌহ, যাতে রয়েছে প্রচন্ড রণশক্তি এবং মানুষের বহুবিধ উপকার। এটা এজন্য যে, আল্লাহ প্রকাশ করে দিবেন যে, কে না দেখে তাকে এবং তাঁর রাসূলগণকে সাহায্য করে। আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী।' (সুরা হাদীদ আয়াত ২৫)

সুতরাং যে ব্যক্তি কিতাব থেকে বিমুখ হবে, তাকে হাদীদ তথা লোহার মাধ্যমে ঠিক করা হবে। একারণেই তো এই দীন টিকে থাকার ভিত্তি হচ্ছে কুরআন এবং তরবারী।

হাদীস শরীফে এসেছে, জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. আমাদের আদেশ করেছেন,

امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضرب بهذا يعني السيف من عدل عن هذا يعني المصحف .

'যাতে করে আমরা ঐ ব্যক্তিকে এটা তথা-তরবারীর মাধ্যমে আঘাত করি যে এটা-তথা কুরআন থেকে বিমুখ থাকে।'

ইবনে কাইয়ুম রহ. বলেন, আল্লাহ তাআলা রাসূল সা. কে কিয়ামতের পূর্বে একটি পথ প্রদর্শনকারী কিতাব এবং সাহায্যকারী তরবারী দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে করে এক আল্লাহর ইবাদত করা হয়।

সুতরাং আল্লাহ তাআলা দীনকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন সুস্পষ্ট প্রমাণ (তথা কুরআন) এবং সাহায্যকারী তরবারীর মাধ্যমে, যাতে করে তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করে একমাত্র তাঁরই ইবাদত করা হয়। তাছাড়া আল্লাহ তাআলা রাসূল সা. এর রিজিক রেখেছেন তরবারীর নিচে।

ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে তরবারীর ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। আসুন দলিল দ্বারা তা বুঝে নিই। আল্লাহ তাআলা বলেন,

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

'যাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ী থেকে অন্যায়ভাবে বহিস্কার করা হয়েছে শুধু এই অপরাধে যে. তারা বলে আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ। আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে (খ্রিষ্টানদের) র্নিজন গির্জা. এবাদত খানা, (ইহুদী-দের) উপাসনালয়ও বিধ্বস্ত হয়ে যেত। (যখন তারা সত্যের উপর ছিল।) এবং মসজিদসমূহ-বিধ্বস্ত হয়ে যেত, যেগুলোতে আল্লাহর নাম অধিক পরিমাণে স্বরণ করা হয়। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করবেন, যারা আল্লাহর সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশা-লী, শক্তিধর।' (সুরা হজ্ব: আয়াত : ৪০)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ

'তারপর ঈমানদাররা আল্লাহ্‌র হুকুমে জালুতের বাহিনীকে পরাজিত করে দিল এবং দাউদ জালূতকে হত্যা করল। আর আল্লাহ্ দাউদকে দান করলেন রাজ্য ও অভিজ্ঞতা। আর তাকে যা চাইলেন শিখালেন। আল্লাহ্ যদি একজনকে অপরজনের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে গোটা দুনিয়া বিধ্বস্ত হয়ে যেতো। কিন্তু বিশ্ববাসীর প্রতি আল্লাহ্ একান্তই দয়ালু, করুণাম।' -(সুরা বাকারা আয়াত: ২৫১)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করার নিদের্শ দিয়ে বলেন,

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

'আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যা-ই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর আর তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদের উপরও যাদেরকে তোমরা জান না; আল্লাহ তাদেরকে চেনেন। বস্তুতঃ যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহর রাহে, তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে ফিরে পাবে এবং তোমাদের কোন হক অপূর্ণ থাকবে না।' (সুরা আনফাল আয়াত: ৬০)

সুতরাং ইসলাম যদি শুধু মাত্র শান্তিপূর্ণ দাওয়াতের মাধ্যমেই প্রচারিত হত; তাহলে কাফেররা কী দেখে ভয় পাবে। তারা কি শুধু মাত্র মুখ থেকে বের হওয়া কিছু কথাকে ভয় পাবে? রাসূলুল্লাহ সা. বলেন,

نصرت بالرعب مسيرة شهر

'শত্রুরা আমাকে দেখে ভয় পায় যদিও আমি একমাসের দূরত্বে থাকি। কাফেররা কি শুধু এরকম কথা থেকেই ভয় পাবে, তাদেরকে বলা হবে- তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর। আর যদি না কর তাহলে তোমরা স্বাধীন! তোমরা যা ইচ্ছা তাই কর। নাকি তারা ভয় পাবে জিহাদকে এবং লাঞ্ছিত হয়ে জিযিয়া প্রদানকে। হ্যাঁ, এই লাঞ্ছনাই তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করবে। রাসূল সা. তরবারী সাথে নিয়ে মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। এবং তিনি তার সেনাপতিদের এ আদেশ দিতেন, যাতে করে মুসলমানদের এ আচরণ দেখে (অর্থাৎ তারা শক্তি থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছে) তাদের থেকে অবাধ্যতার পর্দা সরে যায়।

সাহল ইবনে সাদ রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, খায়বারের যুদ্ধের দিন রাসূল সা. বললেন, আগামী কাল এমন একজনের হাতে (যুদ্ধের) ঝান্ডা তুলে দিব যার হাতে এ দুর্গের বিজয় হবে। সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে আর আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলও তাকে ভালবাসে। সকলে এটা ভেবে ভেবে রাত কাটাল যে, না জানি কার হাতে এটা তুলে দেওয়া হয়। আর প্রত্যেকেই কামনা করছিল যে, এটা যেন তাকে দেওয়া হয়। পর দিন সকালে তিনি বললেন, আলী কোথায়? তাঁকে বলা হল, সে চোখের ব্যথায় আক্রান্ত। তখন তিনি তাঁর থুথু মুবারক তার দুচোখে লাগিয়ে দিলেন এবং তার জন্য দোআ করলেন। ফলে তিনি এমনভাবে সুস্থ হলেন যেন তার চোখে কোন ব্যথাই ছিল না। অতঃপর তার হতে ঝান্ডা তুলে দিলেন এবং বললেন, তারা আমাদের মতো হওয়া (অর্থাৎ ঈমান আনা) পর্যন্ত তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। তুমি তাদের আঙ্গিনায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দাও এবং তাদের করণীয় সম্পর্কে তাদের জানিয়ে দাও। আল্লাহর কসম! তোমার মাধ্যমে যদি একজন লোকও হেদায়াত প্রাপ্ত হয় তাহলে এটা তোমার জন্য লাল উট থেকেও অধিক উত্তম।

অন্য হাদীসে এসেছে, বুরাইদা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সা. যখন কাউকে কোন সৈন্য দলের আমীর নির্ধারণ করতেন তখন তাকে বিশেষ করে আল্লাহকে ভয় করা এবং তার সাথীদের সহযে-াদ্ধাদের সাথে ভাল ব্যবহার করার নির্দেশ দিতেন। অতঃপর বলতেন, তোমরা আল্লাহর নামে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ কর। কাফেরদের সাথে যুদ্ধ কর। তোমরা যুদ্ধ করবে। গনিমতের মাল চুরি করবে না। প্রতারণা করবে না। হত্যার পর অঙ্গচ্ছেদন করবে না। শিশুদের হত্যা করবে না। তুমি যখন মুশরিক শত্রুর মুখোমুখি হবে তখন তাদের তিনটি বিষয়ের দিকে আহ্বান করবে। তারা যেটা বেছে নিবে তাদের থেকে সেটা গ্রহণ করবে। এবং অন্যটি থেকে বিরত থাকবে। তাদেরকে ইসলামের দিকে ডাকবে তারা যদি গ্রহণ করে তাহলে তাদের থেকে তা গ্রহণ করবে এবং তাদের থেকে বিরত থাকবে। তারা যদি ইসলাম গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে তাহলে তাদের কাছে জিযিয়া চাও। যদি তারা সম্মত হয় তাহলে তাদের থেকে তা গ্রহণ করবে এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকবে। যদি তারা অস্বীকার করে তাহলে আল্লাহর সাহায্য চেয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ শুরু করে দাও।

হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ সা. তাঁর উমারাদের আদেশ করেছেন, তারা যেন তরবারী উচুঁ করে ধরে কাফেরদের ইসলামের দিকে ডাকে। সুতরাং তারা যদি ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে তারা লাঞ্ছিত হয়ে জিযিয়া প্রদান করবে। এতেও যদি তারা অস্বীকৃতি জানায় তাহলে তরবারী ব্যতীত আর কোন পথ নেই। অর্থাৎ তাদের সাথে যুদ্ধ কর। রাসূল সা. এর ভাষায়-

هم أبوا استعن بالله وقاتلهم

'যদি তারা অস্বীকৃতি জানায় (ইসলাম গ্রহণ করতে অথবা, জিযয়া দিতে) তাহলে আল্লাহর সাহায্য চেয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ কর।'

এবং রাসূল সা. বলেন, 'আমাকে কিয়ামতের পূর্বে তরবারী দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। যাতে করে একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত-ই করা হয়। তাঁর কোন শরীক নেই। এবং আমার রিজিক আমার তরবারীর নিচে রাখা হয়েছে এবং যারা আমার আদেশ অমান্য করবে তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করা হবে। আর যে ব্যক্তি যে কওমের সাথে সাদৃশ্য রাখল সে তাদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।'

শক্তি ও তরবারীই ইসলাম প্রচারের সবচেয়ে কার্যকরি এবং গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। একারণে কিন্তু ইসলাম কলুষিত হয় না; বরং এর মাধ্যমেই ইসলামের অসাধারণত্ব, বিশেষত্ব এবং সৌন্দর্যতা ফুটে ওঠে। এর কারণে মানুষ দুনিয়া ও আখেরাতের ক্ষতি ছেড়ে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। বেশির ভাগ মানুষই তো বোকা ও নির্বোধ এবং ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ। এখন তাদেরকে যদি আপন অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে তারা প্রবৃত্তির তাড়নায় হক থেকে দূরে থাকবে এবং দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে। সুতরাং এ সকল মানুষকে হক ও কল্যাণের দিকে নিয়ে আসার জন্যই আল্লাহ তাআলা জিহাদের বিধান দিয়েছেন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, বোকা ও নির্বোধকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করা, কল্যাণের দিকে নিয়ে যাওয়াই হচ্ছে হিকমত বা তাৎপর্যপূর্ণ কাজ।
হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,

كنتم خير أمة اخرجت للناس

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় রাসূল সা. বলেন, ‘ তোমরাই হলে মানুষের জন্য সবচেয়ে বেশি কল্যাণকামী, তোমরা তাদের গলায় বেড়ি পরিয়ে নিয়ে আসবে, যাতে (কাছে থেকে ইসলামে সৌন্দর্য দেখে) তারা ইসলাম গ্রহণ করে।’ -ইবনে কাসির
আচ্ছা বলুন তো, জিহাদ ব্যতীত অন্য কোন পন্থায় মানুষের গলায় বেড়ি পরিয়ে নিয়ে আসা যাবে?
হ্যাঁ, জিহাদের কারণেই ইসলাম প্রশংসিত ও বিশেষিত হবে কলুষিত ও তিরস্কৃত নয়।
পরাজিত মানসিকতা সম্পন্নদের বলছি, আপনারা এই দীনকে বিকৃত করার ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করুণ এবং ইসলাম ধর্ম-শন্তি ও নিরাপত্তার ধর্ম, একথা বলে জিহাদ নিয়ে ঠাট্টা করার ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করুণ।
হ্যাঁ, আমরাও বলি ইসলাম শান্তি ও নিরাপত্তার ধর্ম। কিন্তু সেটা হল সকল মানুষকে গাইরুল্লাহর ইবাদত থেকে ফিরিয়ে এক আল্লাহর ইবাদত ও তার হুকুমের দিকে নিয়ে আসার ভিত্তিতে। এটাই আল্লাহর আদেশ। এটা কোন মানুষের বানানো মানহাজ নয়। এবং কোন বুদ্ধিজীবির বুদ্ধিও নয় যে, দায়ীগণ এ ঘোষণা করতে লজ্জা বোধ করবেন যে, তাদের চূড়ান্ত টার্গেট হল,

ان يكون الدين كله لله

-দীনের পুরোটাই একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য হবে।
‘ইসলাম হুজ্জাত ও বয়ানের মাধ্যমে প্রসারিত হয়েছে ঐ সকল লোকদের বেলায় যারা পৌঁছা মাত্র শুনেছে এবং গ্রহণ করে নিয়েছে। এবং তরবারী ও বল প্রয়োগের মাধ্যমে প্রসারিত হয়েছে ঐ সকল লোকের দিকে লক্ষ করে, যারা অহংকার ও অবাধ্য হয়ে ফিরে থেকেছে।
স্মর্তব্য : আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে মানুষকে ইসলামের দিকে ডাকা এবং পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে শিরকের চিহ্ন মুছে ফেলার অর্থ এই নয় যে, মানুষকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করা হবে। এমনটি কখনও নয়। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

‘যারা আল্লাহর রাস্তায় স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে এবং নিজের মনকে সুদৃঢ় করার জন্যে, তাদের উদাহরণ টিলায় অবস্থিত বাগানের মত, যাতে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়; অতঃপর দ্বিগুণ ফসল দান করে। যদি এমন প্রবল বৃষ্টিপাত নাও হয়, তবে হাল্কা বর্ষণই যথেষ্ট। আল্লাহ্ তোমাদের কাজকর্ম প্রত্যক্ষ করেন।’ (সুরা বাকারা ২৬৫)

আর একারণেই তো মুশরিকরা নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করতে চাইলে এ অধিকার তাদের আছে। কিন্তু এটা হবে একটা শর্তের উপর ভিত্তি করে। তা হল, জিম্মি অথবা জিযিয়া প্রদানের চুক্তি করে। সুতরাং ঐ চুক্তির ভিত্তিতে ইসলামী ভুখন্ডে ইহুদীরা ইহুদী অবস্থায় এবং নাসারারা নাসারা অবস্থায় থাকতে পারবে।
ইতিহাস সাক্ষী, ইসলামী ভূ-খন্ডে বিধর্মীরা নিরাপদে থেকেছে। মুসলমানদের পক্ষ থেকে তারা নিজ ধর্ম ত্যাগের ব্যাপারে কোন প্রকারের বাধ্যবাদকতার স্বীকার হয় নি। বিষয়টি প্রাচ্যবিদরাও স্বীকার করতে বাধ্য। প্রাচ্যের ধর্মনিরপেক্ষ গবেষক উলরেশ হেরমান বলেন, ‘মধ্যযুগে বিধর্মীদের প্রতি মুসলমানদের সহিষ্ণুতা দেখে আমি অবাক না হয়ে পারি না। আমি এখানে একটি মাত্র উদাহরণ দিচ্ছি। এই তো সালাহ উদ্দিন আইউবী, তিনি খ্রিষ্টানদের সাথে অকল্পনীয় উদারতা এবং সহিষ্ণুতা দেখিয়েছেন।’ তিনি তার বক্তব্যের শেষের দিকে বলেন, ‘কিন্তু মুসলমানদের প্রতি’ খ্রিষ্টানদের আচরণ এর সম্পূর্ণ বিপরীত।
আমেরিকার দার্শনিক ও ঐতিহাসিক ওল ডিয়ুরান্থ বলেন, ‘উমাইয়া খোলাফতের যুগে ইহুদী, খ্রিষ্টানসহ অন্য সকল বিধর্মীরা এতটাই সৌহার্দ্যের মধ্যে ছিল যে, অন্য কোথাও এটা খুঁজে পাওয়া যাবে না।’
লেবাননের খ্রিষ্টান গবেষক ড. জজ হিন্না বলেন, ‘আরব মুসলমানগণ খ্রিষ্টানদের সাথে অত্যাচার ও কঠোরতা কিভাবে করতে হয় জানতই না। তাঁরা খ্রিষ্টানদের থেকে ট্যাক্স গ্রহণ করে তাদের স্বাধীন ছেড়ে দিত। কিন্তু অতীত ও বর্তমানে খ্রিষ্টানরা সবসময়ই মুসলমানদের ধর্ম ত্যাগে বাধ্য করে আসছে। এবং তারা ধর্ম ত্যাগে অস্বীকৃতি জানালে তাদের কঠিন শাস্তি দেয় এবং তাদের হত্যা করে।
আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন তার দীনকে সম্মানিত করেন এবং তার কালিমাকে উঁচু করেন, আমীন।

এসো কাফেলাবদ্ধ হই
আল-কায়েদা উপমহাদেশ